গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

করোনার করাল থাবায় বর্তমান জনজীবন বিপর্যস্ত। এই ভাইরাস সামাজিক দূরত্বের সাথে সাথে মানসিক দূরত্বও তৈরি করছে। ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক হীন স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উপেক্ষা করে, অসহায় মানুষকে বিপরীত পথে চালিত করার জন্য উদ্যোগী স্বার্থান্বেষী মানুষের সংখ্যাও এখন কম নয়। আমাদের উচিত রোগকে ঘৃণা করা, রোগীকে নয়। মানসিক নির্ভরশীলতা, অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য একতা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে চলাই হোক আজকের মন্ত্র...

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ২, সংখ্যা ১
জুন ২০২০

বর্ষা সংখ্যা

কলম হাতে

পত্রালিকা বিশ্বাস, রিয়া মিত্র, ডাঃ অমিত চৌধুরী, শামসুদ্দিন শিশির, জালাল উদ্দিন লস্কর শাহীন, রমা সিকদার এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

গত বছর জুন মাসে 'পাণ্ডুলিপি' একটি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, আর সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়িত রূপটি হল — 'গুঞ্জন' ই-ম্যাগাজিন এর আত্মপ্রকাশ। তবে এই 'গুঞ্জন' পত্রিকার ইতিহাস আরও পুরানো। সেই পুরানো দিনের 'গুঞ্জন'এর টুকরো টুকরো গল্প আমরা 'দূরের জানালা' শীর্ষক নিবন্ধগুলি থেকে জেনেছি। দেখতে দেখতে আমাদের সবার প্রিয় 'গুঞ্জন' বিগত এক বছরে বহু লেখক-লেখিকা, কবি, সাহিত্যিক, পর্যটক, পাঠক ও সমালোচককে এক সূত্রে গ্রথিত করতে সক্ষম হয়েছে। এই এক বছরের 'গুঞ্জন'এর চলার পথে যে সকল সঙ্গীকে প্রতিনিয়ত পাশে পেয়েছি, তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

শুরু হল 'গুঞ্জন'এর দ্বিতীয় বর্ষের শুভ সূচনা। আগামী দিনে 'গুঞ্জন' আরও কিছু নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আসার প্রয়াসরত। শিশু সাহিত্যকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবনা নিয়ে শুরু করা হবে 'কচিপাতা।' খুব শীঘ্রই এই নতুন বিভাগটির সংযোজন করা হবে। সকল প্রিয় লেখক ও লেখিকাদের কাছে আবেদন আপনারা এই বিষয়ে উৎসাহের সহিত লেখা পাঠাবেন। ঐ বিভাগের জন্য পাঠানো লেখায় 'শিশু বিভাগ' কথাটি অবশ্যই উল্লেখ করবেন। শিশুমনে জাগিয়ে তুলতে হবে পড়ার উৎসাহ। আসুন সবাই মিলে ভবিষ্যতের নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দি সুরুচিপূর্ণ গল্প ও কবিতার স্বাদ। ■

বিনীতা —

রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **‘গুঞ্জন’এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

কলম হাতে

কলম হাতে

মুল প্রচ্ছদ চিত্রঃ Ryan Millier from Pexels

বর্ষা বার্তা চিত্রঃ Darius Krause from Pexels

আনন্দ সংবাদ

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে **শ্রী অসিত চট্টোপাধ্যায়** মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত **'হাওড়া রসিক সভা'** সম্প্রতি **'গুঞ্জন'** পত্রিকার লেখালেখির পাতার সাথে এক যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। অসিতবাবু আমাদের সাথে আগে থেকেই সংযুক্ত আছেন। তাঁর লেখায় অনেকবারই সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের গুঞ্জনের পাতা। ঐ সভার সকল সদস্যদের জানাচ্ছি যে, **তাঁরা তাঁদের স্বরচিত লেখাগুলি, যা শুধুমাত্র হাওড়া রসিক সভাতেই প্রকাশিত হয়েছে, আমাদের ই-মেলে** (contactpandulipi@gmail.com) **পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখাগুলি গুঞ্জনে প্রকাশিত হবে।**

বিনীত

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

(১২)

আশ্রমের সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে স্বচ্ছতয়া পুণ্যসলিলা কলনাদিনী নর্মদা। মায়ের স্পর্শে শিহরণ জাগে শরীরে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে, "মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে অশ্বিনী নক্ষত্রে রবিবার দেবদিবাকর যখন মকর রাশিতে প্রবেশ করেন, তখন দুপুরবেলায় মা নর্মদা জল রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হলেন। একমাত্র নর্মদা, যার পরিক্রমার বিধি আছে। সরস্বতী নদীতে তিনবার, যমুনাতে সাতবার গঙ্গাতে একবার স্নান করলে যে ফল পাওয়া যায়; নর্মদা দর্শন মাত্রই মুক্তি।"

নর্মদা তীরে দেখলাম, একটি ছেলে তার মায়ের শ্রাদ্ধ করছে। আর মায়ের সাথে কত খারাপ ব্যবহার করেছে, তাই বলছে। যেটুকু জেনেছি, মা নর্মদা মা-বাবার অসম্মানকারী আর বিশ্বাসঘাতককে কোনোদিন ক্ষমা করেন না।

আজ ১২ই নভেম্বর ২০১৫, খুব সকালেই মায়ের পুজো করে বেড়িয়ে পড়লাম। কোন গাড়ী চলবে না বলে কাকাজী খুবই চিন্তিত। কিন্তু মায়ের ভাবনা ছিল অন্য। আমরা এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ একটি বিলাস বহুল গাড়ী আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। একটি ২২-২৩ বছরের ছেলে নেমে এসে তার গাড়ীতে

আমাদের ওঠার জন্য অনুরোধ করে বলল, যদি বাস না চলে সে আমাদের ১০০ কিলোমিটার দূরে জব্বলপুরে পৌঁছে দেবে।

কাল আমরা যখন এই রাস্তা দিয়ে মাতাজীর আশ্রমে যাই, তখন সে আমাদের দেখেছে এবং আমাদের তার গাড়ীতে তোলার ইচ্ছে হয়। আজ মা তাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে বলে সে খুব খুশি। বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখি একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কখন ছাড়বে ঠিক নেই। ছেলেটি বারবার খবর নিচ্ছিল বাস ছেড়েছে কিনা। প্রায় দুঘণ্টা পরে বাস ছাড়ল। আমরা এলাম জব্বলপুর স্টেশনে।

আমাদের চলার পথ অনন্ত। তাই এগিয়ে চলেছি অনন্তর দিকে, অসীমের দিকে — কামনা বাসনাহীন, লক্ষ্যহীনভাবে। মায়ের নাম নিয়ে মাকে পরিক্রমা করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, কিন্তু এবার থামতে হবে। আজকেই কলকাতায় ফেরার টিকিট, আবার কবে আসতে পারব জানিনা, মা নর্মদার কাছে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসার প্রার্থনা জানিয়ে ফিরে এলাম কলকাতায়।

নর্মদে হর। ■

মা নর্মদার অশেষ আশিসে শুরু হল
‘গুঞ্জন’এর দ্বিতীয় বর্ষের পথ চলা।
“জয় হর হর নর্মদা মায়ের জয়।”

আমাদের অসুস্থতা

জালাল উদ্দিন লস্কর শাহীন (বাংলাদেশ)

মাদের অসুস্থতা মগজে ও মনে...
বিকৃতির চূড়ান্তসীমা অতিক্রম করেছি সেই
কবে –
মনে পড়ে না - মনে পড়ে না, মনেও যে বাসা বেঁধেছে ঘুণে!
আমরা উল্লাস করি ভিন্ন মতের কেউ অসুস্থ হলে,
আমাদের আনন্দ সোস্যাল মিডিয়াতে পড়ে গলে গলে!
আমরা খুশী হই মানুষের অসুখে অকল্যাণে
রাজ্যের কুচিন্তা আমাদের মননে ও ধ্যানে।
বিশিষ্ট মানুষেরা মারা গেলে বারবার মরে...
আমরা যে নেমে পড়ি চৌদ্দগোষ্টি উদ্ধারে।
কেবলই মতভিন্নতা ও আদর্শের পার্থক্যের কারণে
হিংসার বারুদ জ্বলে আমাদের অনুদার মনে...
মহাপ্রাণ মানুষদের মহাপ্রয়াণে পুলকিত হই,
ভুলে যাই কেউ আমরা মৃত্যুর চেয়ে বড় সত্য নই।
এমন বিকৃত উল্লাস আমাদের চিন্তায় কেন বাঁধে বাসা?
মুখোশের আড়ালে আমরা কেন,
কেন তবে এতো সর্বনাশা?
আমরা কতোটা মানুষ? কতোটা মানুষের ছায়া
মনুষ্যগুণরাজী বিলুপ্ত প্রায় – ধরে আছি মানুষের কায়া।

কালচিত্র

ভীষণ অসুস্থ আমরা, দূরারোগ্য ব্যাধির বাসা
আমাদের মনে,
আমরা উল্লাস করি প্রতিবেশীর কষ্ট ও মরণে।
আমরা বন্ধক রেখেছি আমাদের হৃদয় ও মন
মতাদর্শগত মতপার্থক্যে পরিস্ফুট হয়ে যায় চিন্তাচেতনার
ভিন্ন বিবরণ!
চিন্তার সর্বনাশা দৈন্যদশা আর এমন সংকীর্ণতার পথে
ক্লান্ত পরিশ্রান্ত আমরা নিন্দা আর প্রশংসার অসম দ্বৈরথে।
অন্যের উন্নতি সাফল্য আর ভালো কিছু হলে
আমাদের খুব বেশী জ্বলে, আহা বড় বেশী জ্বলে।
অমঙ্গল আর দেখি যদি কারো কোনো ক্ষতি-
ভাল হয়ে যায় আমাদের মন, পাই আনন্দ অতি! ■

মেবার ভ্রমণ
কুম্ভলগড় পর্ব

মালা মুখার্জী

সকাল ছ'টা নাগাদই যাত্রা শুরু হল। এমনিতে আড়াই ঘন্টার পথ কিন্তু দুটো রুট আছে। একটা হলদিঘাটি, একলিঙ্গ ও নাথদ্বারা হয়ে কুম্ভলগড় যায়, একটা সোজা এন এইচ টোয়েন্টি সেভেন ধরে। আমি প্রথম রুটে যেতে চাইলেও ড্রাইভার সাহেব রাজি নন, ওটা আলাদা ট্যুর প্যাকেজ, দুটো একসাথে করাবে না। “আপনি কুম্ভলগড় না দেখে ওগুলো দেখতে পারতেন। সবাই ওগুলোই দেখে, মন্দির ছিল মাতাজির ভাল লাগত।”

কি করে বোঝাই আমাদের কুম্ভলগড় প্রীতির অন্য কারণ আছে! সিরিয়ালের সময় রাজস্থান ট্যুরিজমের একটা বিজ্ঞাপন আসতো, এক চীনা পর্যটক রাজস্থানে এসে চীনের প্রাচীর দেখল। ওই প্রাচীরটিই নাকি কুম্ভলগড়ের প্রাচীর, ওটির স্থান চীনের প্রাচীরের পরই। চীন এখনও যাইনি, কিন্তু দেশের মধ্যে কুম্ভলগড় তো যেতেই পারি।

“এখানকার রাস্তা বিপদজনক। আদিবাসী এলাকা, একবার হোলির আগের রাতে একা গাড়ি করে ফিরছি, পড়েছিলাম ডাকাতের হাতে। সব কেড়ে নিল, জামা খুলে কাদায় চুবিয়ে

দিল...” ড্রাইভার সাহেব তাঁর অভিজ্ঞতা বলতে লাগলেন, “মাউন্ট আবুর রাস্তাও বিপদজনক। তা আপনারা আবু যাবেন না?”

চিত্র পরিচয়ঃ কুম্ভলগড়ের প্রাচীর...

চিত্র পরিচয়ঃ কুম্ভলগড়...

আমি জানাই এবারের রুটে মাউন্ট আবু নেই, কারণ ওটা আগেই ঘোরা। আমার জনৈকা আত্মীয়া প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী মঠের সদস্যা হওয়ায় দু’বছর আগেই গেছি।

গেছি। আর তাছাড়া এত শীতে আবুপাহাড়ে মাকে নিয়ে যাবনা, ওখানে পুজোর সময় থেকেই খুব শীত!
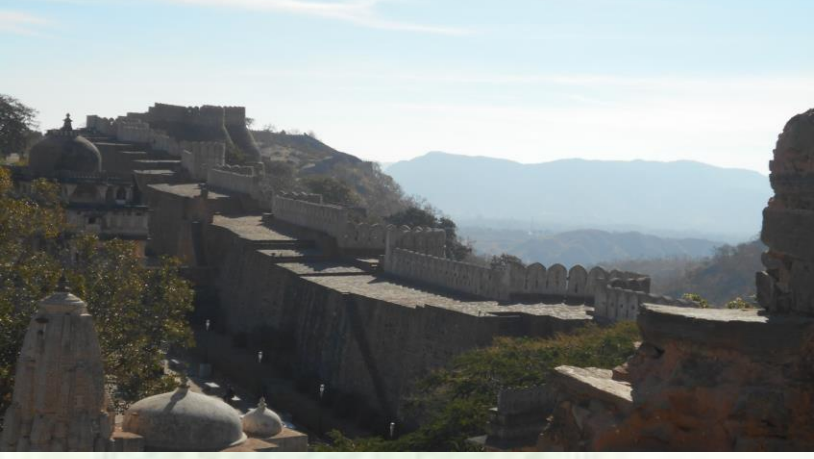
চিত্র পরিচয়ঃ কুম্ভলগড়ের সুউচ্চ প্রাচীর...

আমরা গাড়ী থামিয়ে লোকাল দোকানে চা সিঙ্গাড়া খেলাম, তারপর চললাম সরু পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে কুম্ভলগড়ে। পথে জঙ্গল ও গভীর হতে থাকলো, স্থানে স্থানে লেখা লায়ন সাফারির পয়েন্ট আর সদ্য গড়ে ওঠা রিসর্ট। "এখানে লোকে ট্রেকিং আর সাফারির জন্যই আসে," ড্রাইভার বললেন। এটুকু আমিও বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু আমরা যে ট্রেকিংয়ে অপারগ তা কে বলল?

বিশাল গোল গোল থাম্বাকৃতি প্রাচীর শুরু হোল, পাহাড়ের ওপর এক বিশাল প্রাচীর, যা দেখে চীনের প্রাচীরই মনে হয়। ওই প্রাচীরের পিছনে কুম্ভলগড় দুর্গ। গাড়ি দাঁড়ালো প্রাচীরের আগেই, অলরেডি অনেক গাড়ি এসে গেছে। আমরা নামলাম, গাইডও নিলাম। একটি লোকাল ছেলে,

চারশ টাকায় রাজি। ওইই দুর্গের ওপরে যাবে আমার সঙ্গে, মা একটা রেস্টোরেন্টে বসলেন এবং সঙ্গীও পেয়ে গেলেন। আমার মতো আরও একটি মেয়ে এসেছে মা বাবাকে নিয়ে। তার মায়ের হাঁটুতে ব্যাথা, তাই ওখানেই বসবেন। রামপোল দিয়ে দুর্গে ঢুকলাম, হনুমান পোলে টিকিট নিলাম। এটা সরকারি সম্পত্তি, তাই আর্কিওলজিকাল সার্ভে রক্ষণাবেক্ষণ করে। টিকিটের দাম ভারতীয়দের জন্য মাত্র দশ টাকা।

চিত্র পরিচয়ঃ রাণাকুম্ভের শিবমন্দির...

আমাদের পার্বত্য পথে পথ চলা শুরু হলো গাইডের সাথে। এ দুর্গ রাণা কুম্ভের নির্মিত, কারণ চিতোরে বারম্বার আক্রমণ হতো। এই দুর্গটি এমনভাবে বানানো যে জঙ্গল আর পাহাড়ের অংশই মনে হবে আর এর ওয়াচটাওয়ার থেকে অনেক দূর অবধি নজর রাখা যাবে। এই দুর্গের একটা অলৌকিক কাহিনী আছে, যেটা আমি চিতোর পর্বে বলতে গিয়েও বলিনি।

রাণা কুম্ভ যতবারই দুর্গ নির্মান করেন, ততবারই তা ভেঙে যায়। শেষে তিনি এক তন্ত্রসিদ্ধ ভৈরবের শরণাপন্ন হলে, তিনি বললেন যে এই স্থান অভিশপ্ত, বলি চাই, কোনো সাধুর বলি। ভৈরব বাবা নিজেকে স্বেচ্ছায় বলি দিতে রাজী হলেন, চিহ্নিত করলেন বলির স্থান। তাঁর কাটা মুণ্ডু যতদূর গড়িয়ে গেল সেখানেই বসল দুর্গের প্রথম দরজা, ভৈরব পোল আর বডি যেখানে রইল তত অবধিই হলো দুর্গের পরিধি। তাঁর বলির স্থানে আজও মন্দির আছে।

চিত্র পরিচয়ঃ রণকপুরের জৈনমন্দির...

গাইড বলতে থাকে, ভৈরব পোলের পর নিম্বু পোল, লেবু গাছের তলায়। এরপর সিঁড়ি চড়াই। গাইড মহারাণা প্রতাপের জন্মস্থান দেখাল। সব শেষে ভৈরব বাবার মন্দির

ও রাজারাণীর লিভিংরুম। এরপর সুউচ্চ প্রাচীরের ওপর দিয়ে মাইলখানেক হাঁটতে হাঁটতে নীচের পার্বত্য সিনারির আনন্দ লাভ করা।

চিত্র পরিচয়ঃ রণকপুরের সূর্য্যমন্দির...

কুম্ভলগড় ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এবং রাজস্থানের ছটি হিলফোর্টের অন্যতম। রাজস্থানের ছ'টি হিলফোর্টের মধ্যে চিতোর, জয়শলমীরের কথা আগেই লিখেছি আর আম্বেরের কথা লিখব জয়পুর পর্বে। রণথম্ভোর ও গাগ্রন ফোর্টে আমি এখনও যাইনি। প্রাচীরে হাঁটতে হাঁটতে, গাইড রাণা প্রতাপের কাহিনী বলতে থাকে – যার অনেকটাই বিকালের লাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড ও টিভি সিরিয়াল থেকে নেওয়া। আমি যেহেতু টিভিতে এসব ধারবাহিক মন

দিয়ে দেখি তাই গল্পগুলো নতুন লাগল না। গাইড ছেলেটিও জানালো ওও ওখানেই দেখেছে।

"আচ্ছা তুমি তো এখানকার লোক। ছোটবেলায় দাদা দাদির কাছে এ কেল্লার গল্প শোনোনি? কোনো বিশেষ গল্প?" আমার কথায় মাথা নাড়ে ছেলেটি, উদয়পুরেই পড়াশোনা করে, ছুটিতে এসে গাইডের কাজ করে। তখন কাজ চলার মত ইতিহাসটা ঝালিয়ে নেয়। এই অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে আমার মনে হল ওরাল ট্র্যাডিশনটা কোথাও যেন হারিয়ে যাচ্ছে, অডিও গাইড, লাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড আর ছোট বা বড় পর্দার ডেপিক্সন অনেক কিছুই বদলে দিচ্ছে। আর গাইডও তাই আওড়াচ্ছে।

প্রাচীরে হাঁটা শেষ করে এলাম রাণা কুম্ভের শিবমন্দিরে। বিশাল উঁচু শিবলিঙ্গ প্রায় সাতফুট লম্বা, রাণা নাকি হাঁটু গেড়ে ভোলানাথের মাথায় জল দিতেন। আমার হাইটের মানুষের অবশ্য মই লাগবে। এরপর পুরাতাত্ত্বিক মিউজিয়ম ও হস্তশিল্প দেখলাম। এখানে কম্বল বিখ্যাত আর শাড়ীও। এখানকার শাড়ীগুলো আতাগাছের ফেব্রিকে তৈরি, কাচলে সুগন্ধ ছড়ায়। এরপর আবার সেই খাবারের দোকানে ফিরে এলাম। এসেই ডাবের অর্ডার দিলাম, ভীষন ক্লান্ত লাগছে। মা অবশ্য ওখানে জমিয়ে বসেছেন। কে কোথা হতে এসেছে, কার ছেলেমেয়ে কি করে, কতদিন ঘুরছে ও কোথায় উঠেছে... অনেকেরই আক্ষেপ আর.টি.ডি.সি. তে ঘর না

পাওয়ায়, আমিষ ছাড়া বাঙালীদের বড় কষ্ট হয়। আর.টি.ডি.সি. র মত উৎকৃষ্ট খাবার সব জায়গায় পাওয়া যায় না। এসবই মূলত আলোচ্য বিষয়।
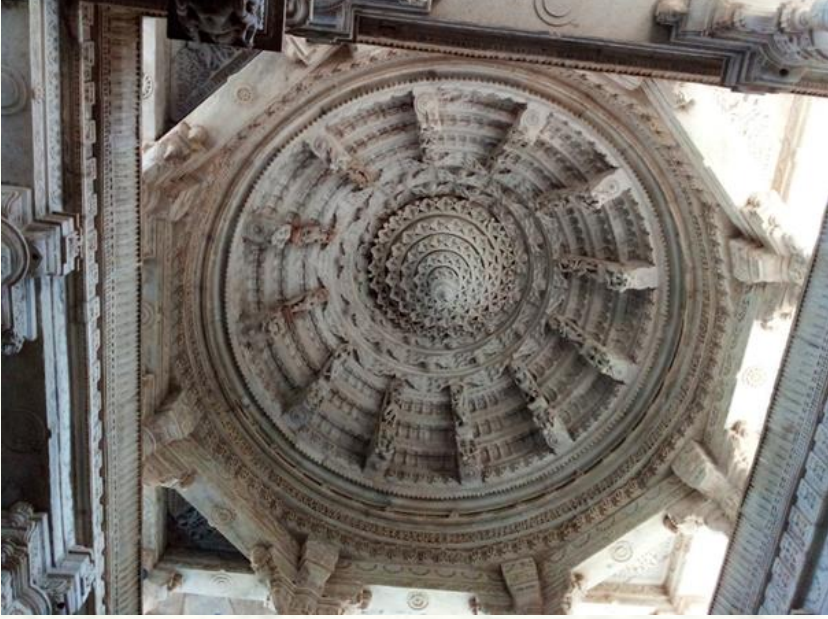
চিত্র পরিচয়ঃ রণকপুরের জৈনমন্দিরের কারুকার্য্য...

এরপর আমাদের গন্তব্য স্থল রাজস্থানের পালি জেলার রণকপুরের জৈনমন্দির। পনের শতকে মার্বেলের তৈরি এই জৈনমন্দিরটি ধর্মশাহ নামে কোনো ব্যবসায়ীর দ্বারা নির্মিত ও প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথকে উৎসর্গীকৃত। রণকপুরে যাওয়ার আগে লাঞ্চ করা প্রয়োজন। ড্রাইভার সাহেব পাহাড়ের কোলে একটি সুন্দর রেস্তরায় গাড়ি লাগালেন, উনিও খাবেন। ওনার খাওয়াটার খরচা দিতে খুব খুশী, এবার ব্যবহার বদলে গেল। আমাদের মত পাংচুয়াল যাত্রী

হয়না। রণকপুর ও কুম্ভলগড়ে অনেক কিছুই দেখার আছে। উনি কাল ভোরের গাড়ীও ধরিয়ে দেবেন, নয়তো ছেলেকে পাঠাবেন। কথায় কথায় রণকপুর এসে গেল। এখানকার মন্দিরও মাউন্ট আবুর দিলয়াড়া মন্দিরের মতোই।

রণকপুরের পর এলাম সূর্য্যমন্দিরে। পাঠকগণের স্মরণে থাকবে শিশোদিয়ারা সূর্য্য বংশীয়। এ মন্দিরও রাজারাই মেইন্টেন করেন। যাঁরা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজকাহিনী পড়েছেন তাঁরা জানেন লেখা শুরু হয়েছিল সূর্য্যদেবের মন্দির হতেই। এ সেই মন্দির কিনা জানি না, তবে শতাব্দী-প্রাচীন মন্দিরের উৎস অনেকটাই রহস্যে ঘেরা। সূর্য্যমন্দিরে প্রণাম ঠুকে যখন ফিরতি পথ ধরলাম তখন সূর্য্যদেব পাটে বসছেন। পাহাড়ে পাহাড়ে লাল রঙ জানিয়ে দিচ্ছে এবার সময় হলো ঘরের পথ ধরার। ...সমাপ্ত ■
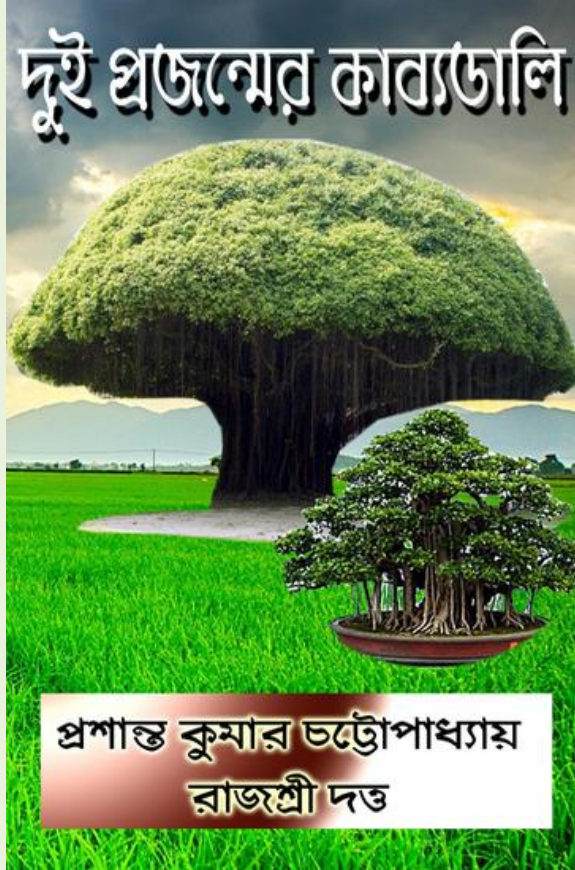
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

প্রাপ্তিস্থলঃ 1) www.flipkart.com

(Search Words: dui-projonmer-kabyadali)

2) E-mail: contactpandulipi@gmail.com

অন্য পৃথিবীর পদ্ম বাগান

স্বাগতা পাঠক

পর্ব – ৪

আজ দুই দিন হল, শ্রাবন্তী আর নিলাদ্রী নিজ নিজ বাড়িতে পরিবারের সাথে গৃহবন্দী হয়ে আছে। রাজর্ষি এইখানে না থেকেও ওদের গৃহবন্দী করে রেখেছে। যত দিন না, নিলাদ্রী আর শ্রাবন্তী ফুলগুলো নিয়ে জাপানে পৌঁছে যাচ্ছে, তারা এইভাবেই নজর বন্দী থাকবে। এমন কি ওদের পরিবারের সকলের ফোন পর্যন্ত ট্যাপ করা হবে, ভয়েজ কল থেকে শুরু করে মেসেজ অবধি। যদি সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়, তখনই পুরো পরিবার সহ ওদের খুন পর্যন্ত করা হতে পারে।

নিলাদ্রী আর শ্রাবন্তী খুব ভালো ভাবেই বুঝে গিয়েছিল যে তারা খুব বাজে রকম একটা ট্র্যাপে পড়েছে। যেখান থেকে বেরোনো, প্রায় অসম্ভব। এখন রাজার কথা মেনে নেওয়া ছাড়া ওদের আর কোনো উপায় নেই। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে শুরু করে, আইন দপ্তরের অনেক উঁচু পদস্থ লোকজন ওর পকেটে। তা না হলে এতদিনে ব্যাঙ্গালোরে রুচিরার হত্যার কেসটা এই ভাবে চাপা পড়ে যেতনা। কিন্তু ওই ফুলগুলো যদি গিয়ে পৌঁছয় রাজর্ষির হাতে, তবেই সর্বনাশ। কারণ সে

কোনোভাবেই এগুলোকে ভালো কাজে ব্যবহার করবে না। টাকার জন্য সে কতোটা নিচে নামতে পারে সেটা এই মুহূর্তে পুর পরিষ্কার। কিন্তু, এখন ওরা কিইবা করতে পারে। পুলিশের কাছে যাওয়া বৃথা। বাড়ি থেকে বেরোতে গেলেই মুশকিল। বেশী জোরাজুরি করলে পরিবারের মানুষের জীবন হানি পর্যন্ত হতে পারে। বিভিন্ন ছদ্মবেশী লোক বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজার কেনা গুন্ডা সব।

প্রথম দিন বাড়ি ফেরার পর, শ্রাবন্তী এবং নিলাদ্রীকে খুব ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়ে গেছে কিছু অজ্ঞাত পরিচয় মানুষ, এখন থেকে ওদের গৃহ বন্দী থাকতে হবে। এমনকি একদিন সিগারেট কেনার অজুহাতে বাড়ি থেকে বেরোতে গিয়েও নিলাদ্রী বাধা পেয়েছে, একজন জমাদার-বেশী লোকের কাছে। ওর কোমরে পিস্তল ঠেকিয়ে, সে জানিয়ে দিয়েছে – বাড়ির রান্না ঘরের চাল, ডাল থেকে শুরু করে, বাথরুম ক্লিনার অবধি, সব কিছুই বাড়িতেই পৌঁছে দেওয়া হবে। যা যা প্রয়োজন লিস্ট করে একটা বিশেষ নাম্বারে মেসেজ করে দিতে হবে। তবুও ওদের বাড়ি থেকে এক পা বেরোনো চলবে না।

শ্রাবন্তীর সাথেও ফোনে কথা বলতে গেলে অনেক ভেবে চিন্তে কথা বলতে হচ্ছে নিলাদ্রীকে। হাতে মাত্র আর দুটো দিন, এরপরই ওদের ছাড়তে হবে এই দেশের মাটি। মনের গভীর থেকে একটা কু-ডাক আসছে। এরপর হয়তো আর

কোনোদিন ওরা নিজেদের পরিবারকে চোখের দেখাটুকু দেখতে পাবে না! ভাবতে ভাবতেই নিলাদ্রীর চোখের কোন বেয়ে গরম এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

রাত তখন প্রায় আড়াইটা, হঠাৎ নিলাদ্রীর ফোনটা বেজে উঠল। শ্রাবন্তীর নম্বর, কিন্তু রিসিভ করার সাথে সাথে, শ্রাবন্তীর মায়ের কান্না ভেজা গলা, "বাবা তুমি এক্ষুনি আমাদের বাড়িতে এস, পিকলু সুইসাইড করার চেষ্টা করেছে, কোনো ভাবেই ওর জ্ঞান ফিরছে না। কিন্তু কোনো ডাক্তারের কাছেও নিয়ে যেতে পারছি না। বাইরে যারা পাহারায় আছে, ওরা ডাক্তার ডাকতে গেছে, বলছে চিকিৎসা হলে বাড়িতে বসেই হবে। বাইরের হাসপাতালে নেওয়া যাবেনা।

নিলাদ্রী কোনো রকমে রেডি হয়ে, গাড়ি নিয়ে বেরোতে গিয়ে দেখলো, সামনে দাঁড়িয়ে এক অজানা মুখ। নিলাদ্রী বুঝেছিল ওর পথ আগলে এই লোকটি ওর যাওয়া পন্ড করবে, কিন্তু যাই হয়ে যাক আজ সে আর কোনো বাধা মানবে না। কারণ এটা পিকলুর জীবনের ব্যাপার। কিন্তু আশ্চর্য রকম ভাবে, লোকটি নিলাদ্রীর কাছে এগিয়ে এসে ওকে জানাল, "উপর থেকে অর্ডার আছে আপনি যেতে পারেন, শ্রাবন্তী ম্যাডামের বাড়ি। কিন্তু সাথে আমিও যাব।"

নিলাদ্রী সেই সময় কিছু ভাবার অবকাশ পেলো না। লোকটিকে সাথে নিয়েই রওনা দিল। সারা রাস্তা, লোকটি নিলাদ্রীর কোমরের কাছে বন্দুক তাক করে রেখেছিল।

কল্প বিজ্ঞান

মধ্যরাতের রাস্তা ফাঁকা, হাই স্পিডে গাড়ি চালালেও, যাদবপুর থেকে চাঁদপড়ার দূরত্ব নেহাত কম নয়। যখন, সে শ্রাবন্তীর বাড়িতে এসে পৌঁছল, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। তবে শীতকালীন ভোর ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাঁপাতে হাঁপাতে দরজার কাছে গিয়ে কলিং বেল টিপতেই, শ্রাবন্তীর বৌদি এসে দরজা খুলে দিল। আর সে তখনই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। বসার ঘরে, শ্রাবন্তীর দাদা, মা আর শ্রাবন্তী বসে। কিন্তু পিকলুকে দেখে কোনো ভাবেই মনে হচ্ছিল না ও অসুস্থ। তবুও নিলাদ্রী জিজ্ঞেস করল, “কি হয়েছে তোমার?”

– কিছুই হয় নি...

– তবে তোমার মা যে আমাকে ফোনে বলল...

– তাছাড়া আর কি কোনো উপায় আছে, আমাদের ফোনটা অবধি ট্যাপ করা হচ্ছে। মা কোনোদিনই ঐভাবে মিথ্যে কেঁদে তোমাকে, ফোন করতে পারত না। তাই সুইসাইড করার একটা নাটক করেছিলাম। যাতে তোমাকে আমাদের বাড়িতে আনানো যায়। অকারণে তো তুমি আমাদের বাড়িতে আসতে পারতে না। সোফার উপর ধপ করে বসে পড়ে, নিলাদ্রী শ্রাবন্তীর বৌদির দিকে তাকিয়ে বলল, “এক গ্লাস ঠান্ডা জল হবে?” জল খাওয়ার পর, নিলাদ্রী বলল, “তা আমাকে এইখানে ডাকার কারণ কি?”

– আমাদের কাছে আর কোনো রাস্তা নেই, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে, আমাদের এই দেশ ছাড়তে হবে, আর

কোনোদিন ফিরতে পারবো কিনা জানি না। তবে এই, ফুলগুলো আমরা কোনো ভাবেই বেহাতে যেতে দিতে পারি না। এত দিনে এইটুকু তুমিও বুঝে গেছ, ফুলগুলো হাতে পাওয়ার পর রাজা দা আমাদের জীবিত রাখবে না।

কথাটা শেষ না হতেই, শ্রাবন্তীর মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ওর মায়ের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে, নিলাদ্রী বলল, "তবে এখন আমাদের কি করতে হবে, কিছু ভেবেছ কি?"

– একটাই রাস্তা, ওই ফুলগুলো আমাদের নষ্ট করে ফেলতে হবে।

– কিন্তু...

– কোনো কিন্তু নয় নিল, এটা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। যা করার এই ঘরের মধ্যেই করতে হবে, কারণ বাড়ির বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় আমাদের নেই। আর এতদিনে যেটুকু বুঝেছি, ওরা অকারণে কোনো ভাবেই বাড়ির ভেতরে আসবে না। তাই বাড়ির ভেতরটা আমাদের জন্য সুরক্ষিত।

বসার ঘরের জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে, পর্দাটা হাল্কা ফাঁকা করে নিলাদ্রী বাইরে তাকাল, বাড়ির গেটের বাইরে, দস্যু টাইপের ছয় সাতজন লোক, যেন শকুনের মতো, বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে... অবশ্য এই রাতের অন্ধকারেই এই ভাবে ওরা পাহারা দেবে, আর দিনের আলো ফুটতেই সব

ছদ্মবেশে ছড়িয়ে পড়বে বাড়ির আশেপাশে, যাতে প্রতিবেশীরা কেউ কিছু টের না পায়।আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ভোরের আলো ফুটবে... কিন্তু ওদের যা করার এই অন্ধকারেই করতে হবে। শ্রাবন্তীর ঘর, দোতলায়। নিলাদ্রী আর শ্রাবন্তী দুইজনে উঠে গেল উপরে...

শ্রাবন্তী ঘরের দরজা খুলতেই, হঠাৎ করেই একটা মাতাল করা সুগন্ধ এসে কয়েক সেকেন্ডের জন্য ওদের কেমন যেন সম্মোহিত করে দিল। নিলাদ্রীর দৃষ্টি আঁটকে গেল ফুলদানিতে রাখা ফুলগুলোর দিকে। কি অপরূপ সুন্দর আর মায়াবী। যেন কত যুগের আপন এই জীবন্ত ফুলগুলো!

শ্রাবন্তীর কথায় নিলাদ্রীর ঘোর কাটল, “কিসের গন্ধ? এতো মিষ্টি... আগে তো কোনো দিন এমন গন্ধ পাইনি!”

– আমার মনে হয় গন্ধটা ওই ফুলগুলোর থেকে আসছে...

– পদ্ম ফুলে এমন গন্ধ হয় নাকি?

– এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমার তো কোনো কিছুই অসম্ভব মনে হচ্ছে না।

– কিন্তু এত দিন এই ফুলগুলো আমার ঘরে আছে, কই এক দিনও এক মুহূর্তের জন্যও আমি কোনো গন্ধ পাইনি... তবে আজ হঠাৎ... কথাটা বলতে বলতে শ্রাবন্তী ফুলদানির দিকে এগিয়ে গিয়ে, ঝুঁকে পড়ল ফুলগুলোর উপর। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে, শ্রাবন্তী বিস্ফারিত চোখে ঘুরে

তাকিয়ে নিলাদ্রীকে বলল, “হ্যাঁ গন্ধটা এই ফুলগুলোর থেকেই আসছে... কিন্তু..!!!”

নিলাদ্রী কি বলবে বুঝতে পারছিল না, শুকনো গলায় ঢোক গিলে সে বলল, “তো এখন আমাদের যেটা করার সেটা করে ফেললেই হয়, খামোখা দেরি করে কি লাভ?”

– “হ্যাঁ।” এই বলে শ্রাবন্তী কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ফুলগুলোর দিকে, আরও দু তিনটে ছোট ছোট ফুল ফুটেছে। এক মুহূর্তের জন্য, শ্রাবন্তীর বুকের ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল। মনের মাঝে কেমন যেন বিচ্ছেদের একটা বেদনা নাড়া দিয়ে উঠল। মনে হল খুব আপন কোনো কাছের কাউকে চিরতরে হারাতে চলেছে সে। নিজের অজান্তেই চোখের কোনটা ভিজে উঠল ওর...

– “পিকলু তাড়াতাড়ি কর।” নিলাদ্রীর ডাকে, শ্রাবন্তী একটু থতমত খেয়ে গেল।

তারপর খুব আলতো করে, সব কটা ফুল সে একসাথে দুইহাতের মাঝে তুলে নিল। ফুলের গন্ধে যেন সারা বাড়িটা ম - ম করছে। ফুলগুলো হাতে নিয়ে শ্রাবন্তী আর নিলাদ্রী এলো বসার ঘরে...

এত সুন্দর ফুল আর সাথে এমন মিষ্টি গন্ধ, পরিবারের বাকি সকলে যেন অবাক বনে গেল। এতো দিন এই ফুলগুলো এই বাড়িতে ছিল অথচ শ্রাবন্তী ছাড়া আর কেউ টের অবধি পায়নি! শ্রাবন্তীর দুই চোখ বেয়ে অবিরাম

জলধারা নেমে আসছে। বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে রেখেছে সে ফুলগুলোকে। যেমন করে সন্তানকে মা বুকের সাথে লেপ্টে রাখে। বসার ঘরের মাঝখানে খালি জায়গাটাতে সে ফুলগুলোকে রাখল। পাশেই রাখা একটা কেরোসিনের ডিব্বা। আসলে ফুলগুলোকে পুরোপুরি ভাবে শেষ করার এই একটাই রাস্তা, কেটে ছিঁড়ে কোনোভাবেই এইগুলো নষ্ট করা যাবে না..., কারণ এর কান্ডটির ছোট থেকে ছোটো অংশ – এমন কি বৃন্তের একটা কাঁটা থেকেও নতুন ফুলের জন্ম হতে পারে। তাই এটাকে পুড়িয়ে ফেলাই শেষ উপায়। ফুলের গন্ধের তীব্রতা সময়ের সাথে সাথে বেড়েই যেতে থাকল। এবার ওদের সকলের মাথা প্রায় ঝিম ঝিম করতে শুরু করেছে। নিলাদ্রী শ্রাবন্তীর কাছে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, "পিকলু, এই ফুল বিস্ময়ের বিস্ময়, এই ফুলে শুধু প্রাণ আছে তাই নয় এদের আবেগ অনুভূতিও আছে, মৃত্যু আসন্ন জেনে এরা গন্ধের মাধম্যে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছে।

অবাক চোখে সকলে তাকিয়ে আছে ফুল গুলোর দিকে, সত্যি তো কেমন যেন একটা অন্যরকম অনুভূতিতে ভরে উঠছে ওদের মন! হয়ত বিপদ বুঝলে এইভাবেই শত্রুকে মন মাতাল করা গন্ধে কাবু করে ফেলার একটা বিশেষ কৌশল এই ফুলগুলোর বৈশিষ্ট্য। এর থেকে বোঝা যায়, নিজের আসন্ন বিপদ ওরা আগাম বুঝতে পারে, এবং মানুষের মুখের কথা বা মনের ভাব বোঝার মতো, অবিশ্বাস্য শক্তি এদের

আছে। বহির্বিশ্বে অন্য কোনো আকাশ গঙ্গায়, কোটি কোটি আলোক বর্ষ দূরে, ঠিক আমাদের পৃথিবীর মতো কিংবা পৃথিবীর থেকেও অনেক উন্নত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করছে, লক্ষ্য কোটি গ্রহ, আর সেখানে রয়েছে এমন সব অদ্ভুত প্রাণের উপস্থিতি – যা পৃথিবীবাসীর কাছে কল্পনার বাইরে। তারই এক জীবন্ত প্রমাণ আজ ওদের চোখের সামনে।

শ্রাবন্তীর বড়দার হাতে মোবাইলের ক্যামেরা চালু করা, পুরো ঘটনাটা রেকর্ডিং করে, রাজর্ষি কে পাঠাতে হবে। এমন ভাবেই পুরো ব্যাপারটা সাজিয়ে নিয়েছে নিলাদ্রী। সে কেরোসিনের ডিব্বাটা নিয়ে এগিয়ে যেতেই শ্রাবন্তী ওর হাত ধরে বলল, “কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না, খুব কষ্ট হচ্ছে, এতদিন এই ফুলগুলো আমার সাথে আমার ঘরে ছিল, আমি ওদের সাথে কথা বলতাম, সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না সব কিছু ভাগ করে নিতাম। ওরা ছিল আমার নির্বাক শ্রোতা। ওদের সাথে আমার একটা অদৃশ্য নিবিড় সম্পর্ক তৈরী হয়ে উঠেছিল। ঘুম থেকে উঠে প্রথম চোখ খুলে ওদেরই দেখতাম আর ঘুমোতে যাওয়ার আগেও ওদের দিকে না তাকিয়ে আমার ঘুম হত না। কিছুতেই আমি থাকতে পারবো না। এইগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা কি খুবই দরকার? শ্রাবন্তীর দুই চোখ রক্তের মতো লাল, যেন কোনো স্বজন হারানো যন্ত্রণায় সে কাতর।

সেই মুহূর্তে, শ্রাবন্তীর চোখের দিকে তাকিয়ে নিলাদ্রীর বুকের ভেতর টা ধড়াস করে উঠল। তার মানে, এই ফুলগুলোর অবিশ্বাস্য শক্তি শুধু মানুষের শরীরে না, মস্তিষ্কেও প্রভাব ফেলে! মানুষের শরীরের সাথে সাথে ব্রেন কেউ কন্ট্রোল করে। এইতো কিছুক্ষণ আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য তো নিলাদ্রী নিজেই কেমন মোহিত হয়ে গিয়েছিল। আর শ্রাবন্তীতো দিনের পর দিন এই ফুলগুলোর সাথে কাটিয়েছে।

নিলাদ্রী বুঝে গিয়েছিল, ফুলগুলোর অসীম প্রাকৃতিক শক্তি কতটা ভালো বা খারাপ সেটা বিবেচনার করার সময় এখন নেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ফুলগুলোকে নষ্ট করে দিতে হবে। না হলে, সকলের সার্বিক ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। তাই সে ঠান্ডা মাথায়, বিষয়টাকে সামলানোর জন্য বলল, “দেখো পিকলু, আমাদের সকলের ভালোর জন্য, এটা দরকার। আর এটাতো তোমারই সিদ্ধান্ত।”

– হ্যাঁ কিন্তু এই মুহূর্তে এইগুলোর সামনে এসে আমি কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ছি।

ঘড়ির কাঁটা ইঙ্গিত দিচ্ছিল আর কিছুক্ষণ পরই ভোরের আলো ফুটবে। সময় নষ্ট না করে, নিলাদ্রী ফুলগুলোর উপর যতটা সম্ভব কেরোসিন ঢেলে দিল। আর পুরোটাই মোবাইল ক্যামেরায় রেকর্ডিং করছিল শ্রাবন্তীর দাদা। এরপরই আর একমুহুর্ত সময় নষ্ট না করেই, নিলাদ্রী দেশলাই ঠুকে ছুঁড়ে

দিল ফুলগুলোর দিকে। সাথে সাথেই ওগুলো দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। কিন্তু হঠাৎ করেই একটা বিচ্ছিরি শব্দ শুরু হলো, মনে হলো কোনো এক প্রকার পাখি বা, ছোটো গোছের প্রাণী এক নাগাড়ে চিৎকার করলে যেমন আওয়াজ হয় ঠিক তেমন। কারো বুঝতে আর কোনো অসুবিধা হলো না শব্দগুলো ওই ফুলগুলোর থেকেই আসছিল। কিন্তু শব্দের তীব্রতা এতো বেশী যে সহ্য করা যায় না। শ্রাবন্তী আর নিল প্রায় একটু ভয় পেয়েই দূরে সরে গেল। কাঁচা পাতা বা ডাল পুড়ে যাওয়ার সময় একটা মৃদু চড়চড়ে শব্দ হয় কারণ তাতে জলের পরিমাণ থাকে। এই ফুল গুলির থেকেও তেমন শব্দ কাম্য। কিন্তু এমন বিকট আওয়াজ, সকলকেই চমকে দিয়েছিল। সব ফুলগুলি পুড়ে ছাই হতে পাক্কা ২৬ মিনিট সময় নিল।

ফুলগুলোর শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার ভিডিওটা সেন্ট করার পর থেকে, রাজার ফোন নম্বর সুইচ অফ আসছে। তারপর থেকে বাড়ির আসে পাশেও আর কাউকে দেখা যায়নি। কোনো রকম হুমকি দিয়ে কল বা মেসেজ আর আসেনি শ্রাবন্তী বা নিলাদ্রীর কাছে। ফুলগুলো ছাই হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, রাজর্ষির আর তার ভাড়া করা লোকজন ও কেমন যেন কর্পূরের মতো উবে গেল।

আজ প্রায় ছয় সাতদিন হল শ্রাবন্তী নিজের ঘরে ঘুমাতে পারে না। মায়ের সাথে মায়ের ঘরে থাকে। ওর বড়দা ঠিক

করল, ওর ঘরটা একটু সুন্দর করে সাজিয়ে দেবে, ডেকোরেশনটা বদলে, ঘরের পুরোনো জিনিসগুলো রিপ্লেস করে দেবে । ঘরের থেকে পুরোনো, ভাঙ্গা চেয়ার, খবরের কাগজ, ভাঙা শো পিস, ফুলদানি নিয়ে রাখা হলো ছাদের একটা কোনায়। সময় করে বাইরে ভাঙা চুরার সাথে বিক্রি করে দেওয়া হবে। পুরোনো ঘরে নতুনের ছোঁয়াতে, শ্রাবন্তী নিজেকে মানিয়ে নিলো। জীবন আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এসেছে। নিলাদ্রী আর শ্রাবন্তীর বাড়ি থেকে ওদের সম্পর্কের একটা শুভ পরিণয়ের দিন ঠিক করে ফেলল। সামনের বছর নভেম্বরে বিয়ের দিন ঠিক হল।

দেখতে দেখতে কেটে গেল পাঁচ ছয় মাস। শীত, গ্রীষ্ম কাটিয়ে বর্ষার আগমন ঘটল, কাদা প্যাঁচপ্যাঁচে চারিদিক। তবুও গ্রাম বাংলার বর্ষা অতীতের মতো বর্তমানেও সুন্দর। এর মধ্যে একদিন অফ ডে তে বাড়িতেই বসে বোর হচ্ছিল শ্রাবন্তী। কি করে সময় কাটাবে বুঝতে পারছিল না। মনে পড়ে যায় ছোটবেলায় ছাদের চিলেকোঠায় গিয়ে বাবার সাথে বৃষ্টি দেখত, রাতের আকাশের তারা দেখত সে। আজ ও তার সেই ইচ্ছেটা আবার চাগার দিয়ে উঠল। তবে আজ আর বাবা পাশে নেই, আছে শুধু বাবার স্মৃতি। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর, কানে হেড ফোন গুঁজে, সে গিয়ে বসলো চিলেকোঠার জানলার পাশে... বৃষ্টির মৃদুমন্দ বেগ। মাঝে মাঝেই বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ছে ওর মুখে চোখে।

সাথে প্রিয় গানের সঙ্গ। বেশ সুন্দর সময় কাটছিল। হঠাৎ, শ্রাবন্তীর চোখ গেলো ছাদের বাঁ দিকে যেখানে বাড়ির পুরোনো কিছু জিনিস পত্র রাখা, একটা ভাঙা চেয়ারের নিচ থেকে হলুদ রঙের কিছু একটা দুলে দুলে উঠছে, কিন্তু ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অনেক চেষ্টা করেও সে ঠাহর করতে পারছে না, তাই সে ফোনটা রেখে উঠে গেল দরজার কাছে, তবুও ঠিক কিছুতেই বুঝতে পারলনা জিনিসটা কি! বাকি সব পুরোনো জিনিসের মাঝে চাপা পড়ে আছে। কি-না-কি হবে, এই ভেবে ও ফিরে আসতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। বুকের মাঝে হঠাৎ একটা অজানার ডাক। এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে শ্রাবন্তী বৃষ্টি মাথায় নিয়েই ছুটে গেল ছাদের ওই নির্দিষ্ট দিকে। বাকি জিনিসগুলো সরিয়ে দিতেই, যেটা ওর চোখে পড়ল তাতে শ্রাবন্তী অবাক হয়ে দুই পা পিছিয়ে গেল। কোনা ভেঙে যাওয়া, চিনা মাটির ফুলদানি থেকে মাথা তুলে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে, একটি হলুদ রঙের সদ্য ফোঁটা পদ্ম ফুল... এর মধ্যেই হঠাৎ শ্রাবন্তীর ফোনটায় বেজে উঠলো ওর প্রিয় গানের রিংটোন ... "আসমাঁ কে পরে/ এক জহাঁ হৈ কহীঁ/ ঝুঠ সচ কা বহাঁ/ কায়দা হী নহী/ রোশনী মেঁ বহাঁ কী/ অলগ নূর হৈ/ সায়ে জিস্মোঁ সে আগে/জহাঁ জাতে হৈ (জাতে হৈ)/ চল বহাঁ জাতে হৈঁ/ চল বহাঁ যাতে হৈঁ..."

(आसमां के परे/ एक जहाँ है कहीं/ झूठ सच का वहाँ/ क़ायदा ही नही/ रोशनी में वहाँ की/ अलग नूर है/ साये जिस्मों से आगे/ जहाँ जाते है (जाते है)/ चल वहाँ जाते हैं)

...ক্রমশঃ ■

করোনাকালে জন্মদিন

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

দুনিয়া জুড়ে এখন ব্রাহ্মণ বেড়ে গেছে। জাগ্রত মা করোনাশ্বরীর পুজো চলছে। মা কে স্বীকার না করলে বা তাচ্ছিল্য করলেই একেবারে নিচু জাতের তকমা দিয়ে একঘরে করে রাখছে এই উঁচু জাতের লোকেরা।

গিয়েছিলাম একটু বাংলাদেশ বেড়াতে। যখন ফিরে এলাম, এয়ারপোর্টে দেখি ব্রাহ্মণ কুল লাইন দিয়ে রয়েছে। আমার মুখ দেখেই নাকি বোঝা যাচ্ছে যে আমি মা করোনাশ্বরীকে অবজ্ঞা করেছি। বললাম, "আমি আপনাদের মতো নিখাদ ব্রাহ্মণ, তিয়াত্তর দিন এক ঘরে বসে জপ ধ্যান করেছি।" কে কার কথা শোনে! ঠেলে তুলে দিলো নিচু জাতের গাড়িতে। গাড়ি নিয়ে গিয়ে ফেলল কোয়ারেন্টাইন সেন্টার নামক নিচু জাত শুদ্ধ করণ সেন্টারে, দিল এক ঘরে বন্দী করে। প্রায়শ্চিত্ত করে ট্যাক্সি করে বাড়িতে ফিরে এলাম।

আমাকে দেখেই সহধর্মিনীর মাথা গরম হয়ে গেলো। বললেন, "তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান হবে না? তুমি জানো না বাড়িতে আমরা মা করোনাশ্বরীর ব্রত পালন করছি?" বললাম, "চোদ্দ দিন ধরে, চোদ্দ শাক খেয়ে, চোদ্দ প্রদীপ জ্বালিয়ে –

বিড়ম্বনা

এমনি কি চোদ্দ পুরুষের নাম জপ করে আমিও তো তাই পালন করে এলাম।” সহধর্মিনী বলল, যদি ঠিক মতো পালন করতে তবে ট্যাক্সি করে বাড়ী আসতে না। বুঝলাম বাড়ির লোকজন এমন কি পাড়া প্রতিবেশী সবাই এখন ব্রাহ্মণ। কোনো কথা বলার সুযোগ দিলো না কেউ। বাড়ির সামনে একটু উঠান মতো আছে। সেখানে একটি আম গাছ আছে, তার তলায় বড় গামলার দু' গামলা জল ছিলো। সে বলল, “একটাতে তোমার পরনের সব জামা কাপড় গুঁড়ো সাবান দিয়ে ভিজিয়ে কেচে দাও।” অগত্যা! সহধর্মিনীর কাছে একটা তোয়ালে চাইলাম। সে বলল, “কাপড় মেলার তারে একটা গামছা রাখা আছে, ওটা জড়িয়ে জামা কাপড় ছেড়ে স্নান করে নাও। দেখ আমগাছ তলায় একটা সাবান আছে, ওটা ভালো করে গায়ে মেখে স্নান করো।” যথা আজ্ঞা! আমগাছের তলায় একটা পাঁচ টাকা দামের ‘লাইফবয়’ সাবান শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়, তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, “চিন্তা নেই তুমি ‘লাইফবয়’ আর আমার ‘লাইফহেল’। স্নান সেরে সহধর্মিনীকে বললাম আর একটা গামছা দাও গা মুছব। সহধর্মিনীর গম্ভীর উত্তর, “যেটা পরে স্নান করলে ওটা দিয়েই গা মুছে নাও।” কি মুস্কিল! খানিক চুপ করে থেকে বললাম, “তা তুমি চোখ বন্ধ করে থাকবে নাকি আমি চোখ বন্ধ করে মুছবো?” বিপদের আঁচ পেয়ে সে বলল, “এই ঘরের প্যাসেজ দিয়ে একেবারে পেছনের বাথরুমে চলে যাও, দেখো পারিও

না যেন!” হা ঈশ্বর জন্মের সময় কেন যে দুটো পাখা দিলে না? সহধর্মিনীকে ভগবানের অপারগতার কথা বললাম। তিনি সুর সপ্তমে চড়িয়ে বললেন, “আঙুলের ডগা দিয়ে হেঁটে যাও।” তাই গেলাম, তবে তাতে হাঁটলাম নাকি ভাসলাম বুঝলাম না। গা মুছে বেরিয়ে দেখি তিনি গঙ্গা জল ছিটানোর মতো স্যানিটাইজার ছেটাচ্ছেন আমার পদ চিহ্নের ওপর। বুঝলাম, আবার আমার জাত গেছে। ঘেরা বারান্দায় আমার স্থান হলো। এর পরের কাহিনী আর কহতব্য নয়। খাবার, চা যে ভাবে পরিবেশিত হচ্ছে – তা দেখে নিজেকে মনে হচ্ছে লাশ কাটা ঘরের ডোম।

এরই মাঝে এসে গেলো আমার জন্মদিন। সকাল থেকে আমার সহধর্মিনী ডোম পরিচর্যায় ফাঁকি দেয়নি। নিত্যকার দিনের মতোই সব হচ্ছে। দুপুরে থালা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছি – কখন সহধর্মিনী শালপাতায় করে ভাত এনে একফুট ওপর থেকে ধপাস করে তা আমার থালার ওপর ফেলবে! আজ যেন একটু দেরিই হচ্ছে। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছি খাবার টেবিলে বিশাল কাঁসার থালায়, কাঁসার বাটিতে বাটিতে করে পঞ্চ ব্যঞ্জন সাজানো হচ্ছে। বললাম, “খেতে দেবে?” উত্তর হলো, “হ্যাঁ, তোমার জন্যই সব সাজানো হচ্ছে। আহা! কি আনন্দ! লাশকাটা ঘরের ডোম থেকে একেবারে ব্রাহ্মণ! কিন্তু বিধিবাম, দূর থেকে নির্দেশ হলো মাস্ক পড়। বললাম, “খাবো কি করে?” উত্তর

বিড়ম্বনা

এল, "থালাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে মাস্ক খুলে খাবে।" কোনমতে তা হাত বাড়িয়ে নিলাম। মা কিছুদিন আগেই চলে গেছেন, তাই আনন্দ দুঃখ মিশিয়ে খেয়ে নিলাম। শ্বাশুড়ির বৌমা মিলে জম্পেশ রান্না করেছে। মনে মনে সহধর্মিনীকে আশীর্বাদও করলাম। খাওয়াটা মন্দ হলো না।

করোনাশ্বরীর অভিশাপ কি আর এত তাড়াতাড়ি ঘাড় থেকে নামে! খাওয়ার পরই হুকুম হলো, "পেছনের বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ওগুলো সাবান দিয়ে মেজে ফেলো।" আগে জানলে...

পাঁচ সেরি সেই বাসন পত্র মেজে আনলাম। আবার তাতে গঙ্গা জল দিয়ে – থুড়ি থুড়ি Ethanol Hydrogen Peroxide দিয়ে ধুয়ে ঘরে তোলা হলো। আমি লাশ কাটা ঘরের টেবিলে – থুড়ি থুড়ি, আমার বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। খাওয়াটা একটু বেশিই হয়ে গেছে, ভুল ভাল কথা বের হয়ে যাচ্ছে। ■

শৈত্য

সন্দীপ বাগ

সৈকত যখন কলেজের টপার হয়ে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে ওদের কলেজ থেকে একমাত্র মাস্টার্স করার সুযোগ পেল, তখন আনন্দে মানসী বন্ধুদের মেসেজ করল – সবাই শুক্রবারে তিনটেয় কলেজ ক্যান্টিনে আসবি সৈকতের অনারে আমি খাওয়াবো। মানসীর অনার্স কেটে গেছিল ফার্স্ট ইয়ারেই। পাস কোর্সেও সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট হতে পারবে কিনা ঠিক নেই। তবু কেউ অবাক হল না। কারণ ওদের কেমিস্ট্রিটা সবাই জানে।

নামী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার বাবার একদম পছন্দ নয় সায়েন্স ছাড়া অন্য কোন বিষয়। প্লাস টু-তে কুঁকিয়ে সায়েন্স পাশের পর মানসী বাবাকে বলেছিল, "বাপী সায়েন্স একদম ভাল্লাগে না। আমাকে একটু নিজের মতো পড়তে দাও না।"

উল্টে ওর বাবা বলেছিল, "রেজাল্ট খারাপ হয়েছে তো কী? অনার্সে ভর্তির চ্যানেল করছি।"

মানসী মৃদু রাগে বলেছিল ফাইন আর্টস নিয়ে পড়ার কথা। সে নাচে, গানে, আঁকায়, গল্প-কবিতা লেখায়

ফাটাফাটি। কিন্তু ওর বাবার সপাটে উত্তর — "ওগুলো ফালতু বোগাস ঝরতি পড়তি ছেলেমেয়েরা পড়ে। ওর কোনো ভবিষ্যৎ নেই।"

সৈকতের আবার সারাদিন সায়েন্স নিয়ে ভাবনা। মানসীকে সে সব সময় গাইড করে। কি ভাবে পাশ করা যাবে তার টিপস্ দেয়। সেও বলে বিজ্ঞানই ভবিষ্যৎ। সবসময় মানসী আর সৈকতকে কলেজে একসঙ্গে দেখা যায়। ওদের কথা আর ফুরোয় না। কলেজের সোস্যালে মানসীর গান শুনে সবাই যখন প্রশংসা করছে। সে সৈকতের কাছে জানতে চায় — বল কেমন লাগলো? তার কান অন্যের নয় শুধু সৈকতের প্রশংসা শুনতে চায়। সৈকত সেটা জেনে চুপ করে থেকে ওকে আরো রাগিয়ে দেয়। মানসী জানে সৈকত খুব গরীব ঘরের ছেলে। অনেক কষ্টে একটা এন.জি.ও.র সাহায্য করা অর্থে সে পড়াশোনা চালায়। সাগরদ্বীপ থেকে এসে বেলঘড়িয়ার একটা সস্তার মেসে থেকে কলেজে পড়াশোনা চালাচ্ছে। মানসীর মানসিক শান্তি একটাই সায়েন্স পড়তে এসে সৈকতকে পাওয়া। একদিন মানসী সৈকতকে বলল — আমাদের বাড়ি যাবি? নিমরাজি সৈকতকে গড়িয়াহাটের বাড়িতে নিয়ে গেছিল ট্যাক্সিতে চাপিয়ে। মানসীদের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ফ্ল্যাট ও পড়ার ঘর দেখে তো সৈকত অবাক। ভাবল এত বড় লোকের মেয়ে আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেশে! সে চলে আসার পর, মানসীর মা বলেছিল — কাদের সঙ্গে মিশিস

প্রতীক্ষা

মামন, ঘেমো গন্ধ গায়ে, খড়ি ওঠা প্যান্ট পরে এসেছিল ভিখিরিদের মতো। ওটা তোর বন্ধু? সমাজে আমাদের একটা স্টেটাস আছে তো নাকি? ওর বন্ধুকে আবাসনের অন্যরাও আড়চোখে মেপেছিল সেদিন।

সৈকতের সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। সে দিন সারা রাত না খেয়ে কেঁদেছিল মামন ওরফে মানসী। তারপর বি.এস.সি. পাশ না করতে পেরে মানসী পরের বছর অন্য কলেজে আবার আর্টসে ভর্তি হলো। সৈকত এম.এস.সি.তে ফার্স্ট ক্লাস থার্ড হয়ে ডক্টরেট করতে চলে গেল জে.এন.ইউ.তে। দিল্লী চলে যাবার আগে শেষ যেবার দেখা হয়েছিল কলকাতায়, তখন মানসী সৈকতকে বলেছিল, “কিরে তুই তো এখন উড়ন্ত ঘোড়া। বিশ্ববিদ্যালয়ে তোর এখন অনেক নাম। পরে আমাকে চিনতে পারবি তো?”

স্কলারশিপের টাকায় সৈকতের এখন দৈন্যতা ঘুচেছে। ব্র্যান্ডেড জামা প্যান্টের সঙ্গে শেষ দিন মানসীর সঙ্গে সাউথ সিটি মলে দেখা করার সময় হালকা ডিওডারেন্ট ঘাড়ে গলায় লাগিয়ে এসেছিল। কফি শপে বসে আবেগঘন হয়ে সৈকত সেদিন মানসীর হাতে হাত, চোখে চোখ রেখে জানিয়ে ছিল ওর ভালবাসার কথা। মানসী বলেছিল, “তোর অপেক্ষায় রইলাম।”

তারপর এ কাজ সেকাজে দুজনেই ব্যস্ত। গঙ্গা দিয়ে জল গড়িয়ে গেল আরো বছর পনেরো। মানসী মানসিক প্রতিবন্ধীদের একটা এন.জি.ও. চালায়, এদের আঁকা

শেখায়। একটা ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে অন্য রকম সক্ষম পেছিয়ে পড়া ছাত্র ছাত্রীদের সাপোর্ট দেয়। শিশুদের বাবা মায়েদের মানসিক জোর বাড়াবার জন্য রোজ দিনরাত ভাবে। মানসীর বাবা বার বার বিয়ের কথা পাড়তে চাইলে সে বলে চিন্তা না করতে। মাকেও বলে, "আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।" সারাক্ষণ প্রার্থনা করে যাতে সৈকত জীবনে অনেক বড় হয়। কাজের চাপে সৈকতের সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তা ছাড়া ভাবনার জগতেও এখন দুজনের অনেক তফাৎ। সৈকতের পুরোনো নম্বর ডাস নট এক্সিস্ট বলছে। মানসী অবসর পেলেই শাস্ত্রীয় নৃত্যের তালিম নেয়। আঁকা, গানটা মন দিয়ে করে এখনও। ভাবে সৈকতের সঙ্গে দেখা হলে কোন শাড়িটা পরবে, কোন গানটা শোনাবে। মা বলে, "সারাক্ষণ বিড় বিড় করে কি বকিস? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকদিন ধরেই তার এসব নিয়ে শ্যাডো প্র্যাকটিস চলছে।"

ওদের এন.জি.ও.তে একটা বিদেশী সংস্থা থেকে অনুদান আসে। সেটার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ছাড়পত্র লাগে। সল্টলেকের রাজ্য সমাজ কল্যাণ দফতর থেকে ছাড়পত্র পেলেও কেন্দ্রের ছাড়পত্র আটকে আছে। সেজন্য ওরা ভীষণ অসুবিধায় আছে। হাজার একটা হিসেব, সবার ছবিসহ পরিচয় পত্র দেবার পর কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজ কল্যাণ দফতরের এক আধিকারিক মানসীর আধার কার্ড, প্যান কার্ডসহ গুচ্ছের কাগজ

চেয়ে পাঠালো। ওই দফতরে ফোন করে মানসী জানতে পারল ওখানকার ডিরেক্টর ডাঃ এস. পারুই এটা দেখছেন। বারে বারে সে ব্যর্থ হল সেখানকার ছাড়পত্র পেতে। এদিকে প্রায় পঞ্চাশটা মানসিক প্রতিবন্ধী বাচ্চার খাওয়া পরা লাটে ওঠার জোগাড়। মানসী ঠিক করল সামনের সপ্তাহে কালকা মেলে সে একাই দিল্লী গিয়ে তদবির করবে, বাঙালী আধিকারিককে বুঝিয়ে বলতে সুবিধা হবে। টাকা বাঁচাতে, এই তীব্র গরমে স্লিপার ক্লাসে চেপে প্রথম বার নতুন দিল্লী পৌঁছে লোধী রোডের অফিসে গেল সে। ডাঃ পারুই এর সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করাই ছিল। সব ফাইল নিয়ে প্রস্তুত হয়েই অফিসে গেল।

আধ ঘন্টা বসার পর, ডাঃ পারুই এর অল্প বয়সী মহিলা সেক্রেটারি তাকে বলল সাহেবের ঘরে যেতে। সাহেবের ঘরে গিয়ে মানসী দেখে, কোর্ট স্যুট-টাই পরে টেবিলের ওপারে কয়েক ফুটের ব্যবধানে বসে আছে সৈকত ওরফে ডাঃ এস. পারুই। সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলতে যাচ্ছে কী রে সৈকত? তুই এখানে? লোকজন পরিবৃত হয়ে বসে থাকা সৈকত মানসীকে দেখে আরো গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ইয়েস ম্যাম। প্লিজ টেল মি হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ? আই এ্যাম ইন এ লিটিল বিট হ্যারি। টেল মি, টেল মি...।" মানসী বাকরুদ্ধ হয়ে শুনল ভালোবাসি ভালোবাসি। কিছু না বলে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে বাসে চেপে নিউ দিল্লী স্টেশনের দিকে রওনা দিল। জুন মাসের তীব্র গরমে তার শীত করতে লাগল। ■

বর্ষার বার্তা
শামসুদ্দিন শিশির
পত্রালিকা বিশ্বাস
দোলা ভট্টাচার্য
রমা সিকদার
রিয়া মিত্র
মঙ্গলপ্রসাদ মাইতি

বাংলার বর্ষা ও জীবনধারা

শামসুদ্দিন শিশির (বাংলাদেশ)

বর্ষার মাতাল করা অপরূপ দৃশ্য যে কোন কাউকেই উদাস করে। একটানা রিমঝিম ছন্দে বৃষ্টির অবিরাম শব্দে মন পাগল হয় না – এমন মানুষের সংখ্যা বিরল। কবি গুরুর কবিতায় যেমন করে বর্ষা এসেছে "রাশি রাশি ভারা ভারা/ ধান কাটা হলো সারা।/ ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরসা।/ কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরষা।" অথবা "আমার বর্ষা জলে ভেজা প্রেমের প্রথম কদম ফুল" গীতিকবির গানে, কবিতায় বর্ষা বন্দনার সব শব্দেই বর্ষার বাংলার চিরায়ত রূপকে সাজানো।

আমি যেভাবে বাংলার বর্ষাকে উপভোগ করেছি তাই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। দিন নেই, রাত নেই আকাশ কেঁদেই চলছে। একদিন, দুদিন করে সাতদিন পর্যন্ত ঝরছে তো ঝরছে থামার কোন নিশানা নেই। এ কয়েক দিন কালো মেঘে ঢেকে রাখা আকাশে, সূর্য মামার দেখা নেই। মেঘলা আকাশে গুড়গুড় শব্দ আর মাঝে মাঝে বিদুৎ চমকানো। পথ-ঘাট, মাঠ-প্রান্তর, পুকুর-জলাশয় জলে টইটম্বুর হয়ে মানুষের কষ্ট সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে দেয়। অনেক সময় গবাদিপশু, পাখিসহ একই ঘরে থাকতে হয়। পানির তোড়ে ঘর বাড়ি ভেসে যায়। তখন কেউ কেউ

নৌকায় বসবাস করে। সাথে গবাদিপশু পাখি নিয়ে যায়, সে এক অসহনীয় যন্ত্রণা। নিজের খাবার ব্যবস্থা করা, গবাদিপশুর খাবার ব্যবস্থা করা, খুব কঠিন হয়ে পড়ে। মানুষের দুর্দশার শেষ নেই।

বর্ষায় ছোটরা মজা বা আনন্দ একটু বেশিই করে। তাদের কাজ খাওয়া আর জলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো। সুযোগ পেলেই ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া আর দিঘির জলে ডুব সাঁতার দিয়ে খেলা। শাপলা বা শালুক তোলা, মাছ শিকার, বৃষ্টির জলে ভেজা। ইচ্ছে করে কাদা-মাটিতে আছড়ে পড়া, আম কুড়ানো আরও কত আনন্দ। সে আর লিখে শেষ করা যাবে না। কখনো কখনো বৃষ্টি আর বজ্রপাত শুরু হয়, তখন বড়রা ছোটদের ঘর থেকে বের হতে দিতে চান না।

সে যুগে, মা, চাচী, দাদী সবাই মিলে কাঁথা সেলাইয়ের কাজ শুরু করে দিতেন। তখন ঘরের বাইরে কোন কাজ করার কোন সুযোগ থাকতো না। ছোটদের দিয়ে কাঁথা সোজা করে ধরে সেলাইয়ের জন্য সাহায্য নিতেন তাঁরা। এই সুযোগে ছোটরা কাঁথায় গড়াগড়ি খেতো। অনেকেই সুঁইয়ের খোঁচাও খেয়েছে। অবিরাম বৃষ্টির কারণে মোরগ মুরগীগুলো ঘরের পাশে ঢেলার উপর একপায়ে ভর করে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে আর ঝিমিয়ে পড়ে, তখন অবশ্য হাঁসদের আনন্দ বেড়ে যায়। যতদূর চোখ যায় ঘুরে

আসে। বর্ষার থৈ থৈ পানিতে সাঁতার কাটার মজাই আলাদা। গৃহস্থের সংশয় থাকে সন্ধ্যায় হাঁসগুলো ঠিক ভাবে ঘরে ফিরে আসবে তো! নয়তো কাদা জল মাড়িয়ে খুঁজে আনতে হয়।

বর্ষায় সকালের নাস্তায় থাকতো মুড়ি বা খই খেজুরের গুড় মিশিয়ে মোয়া বানিয়ে খাওয়া। মিষ্টি আলু সেঁকে বা মিষ্টি আলু চুলার ছাইয়ের ভেতর পুড়ে খাওয়া। কখনো কখনো মা, ফুফু দাদী অবসর থাকলে বিভিন্ন রকম পিঠা তৈরি করে দিতেন। বিকেলের নাস্তা বেশির ভাগ সময়ই হতো ডাটা শাক, কচু শাক বা পাট শাক সিদ্ধ সাথে শুকনো মরিচ টালা।

ও একটা কথা বলাই হয়নি, আমাদের ছিল যৌথ পরিবার। একসাথে ১২/১৪ জন বাচ্চা থাকতাম। লম্বা লাইন ধরে বসে নাস্তা, ভাত, ঘুমানো সবই চলতো। সেই ফেলে আসা দিন আহা কি মধুর ছিল। বৃষ্টি থামতে দেরি হলেও আমাদের বের হতে দেরি হতো না, যদিও মায়ের বারণ থাকত। বার বার কাপড় ভেজানো। মায়ের কষ্ট বাড়ে, শুকাতে সময় লাগে। রোদ নেই, শুকাতে দেওয়ার জায়গা নেই। তারপরও একটা ব্যবস্থা হয় চুলার উপর বাঁশ বা রশি বেঁধে কাপড় শুকানোর। কিন্তু সেখানে কয়টা কাপড়ই বা দেওয়া যায়? বৃষ্টি ভেজা পথ, পিছলে হয়ে থাকে। কর্দমাক্ত পথে জুতা বা চপ্পল পরে চলাও মুশকিল। পিচ্ছিল পথে কতবার যে আছাড় খেয়েছি তার হিসেব নেই। বর্ষার দিনে

বর্ষার বার্তা

বৃষ্টি থামলে আমাদের যে কী আনন্দ হতো! বড়দের সাথে মাছ ধরতে জলে থৈ থৈ মাঠে চলে যেতাম। কখনো পুলের নীচে পানির স্রোতের সাথে আসা মাছ জাল ফেলে ধরতাম। মাছ ধরার আনন্দ বাড়তো, যখন দেখতাম জলে নববধুর সাজে রঙিন শাড়ি পড়ে মাছগুলো আসছে। বিশেষ করে পুঁটি মাছ। বৃষ্টির পানিতে কৃষকের ফসল ডুবে যেত, মাছ চাষির মাছ ভেসে যেত। অনেকেই একবেলা ঠিক মতো খেতে পারতো না, কেউ কেউ মাড়সহ ভাত খেয়ে দিন কাটিয়ে দিত। এগুলো বর্ষার কষ্টের কথা।

বর্ষায় ছোটদের ডাক পড়তো রসই ঘরে রান্নার সময়। আধ ভেজা লাকড়ি দিয়ে রান্না করতে গিয়ে আগুন জ্বালাতে মায়ের খুব কষ্ট হত। তখন বাঁশের চোঙ্গা বা লোহার পাইপ দিয়ে ফুঁ দেওয়ার পর আগুন জ্বলে উঠত। কিন্তু এই সময় রসই ঘর সহ আশ পাশ ধোঁয়ায় ভরে যেতো। বৃষ্টি আর ধোঁয়া এক অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি করত। বৃষ্টি থামলেই আমরা বাড়ির পাশের দীঘিতে নেমে জল কেলিতে মত্ত্ব হয়ে যেতাম। কলাগাছ দিয়ে ভেলা বানিয়ে সারা দিঘিতে ভেসে বেড়াতাম। তবে খুব সাবধানে দিঘির কিনারে কিনারে ভেলা ভাসাতাম। দিঘির অশান্ত জল বাতাসে ঢেউ খেলতো, আমরা ভয় পেয়ে যেতাম।

বর্ষায় জল বাড়ার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে শাপলা বাড়তো। আমরা খুব ভোরে কে, কার আগে শাপলা তুলতে

যাবো, সেই প্রতিযোগিতা চলতো। শাপলা দিঘির জলই খেতাম বা বাড়ি এনে তরকারি রান্না বা শাক ভাজা হতো। সেদিন আর ফিরে আসবে না। দিঘির জলে আমাদের মূল কাজ ছিল মাছ ধরা। বর্ষায় জল বাড়তো মাছও বড় হতো। বিশেষ করে শোল মাছ, বোয়াল মাছ। বর্ষার শুরুর কয়েকদিনের মধ্যেই শোল মাছ, টাকি মাছ পোনা ছাড়তো। আর মা মাছ পোনাদের নিয়ে দল বেঁধে চলতো। শিকারীরা মা মাছ ও পোনাসহ ধরে ফেলত। তখন আমার খুব খারাপ লাগতো। আমি ভাবতাম বড় হলে পোনাগুলো অনেক মাছ হতো। আমরা অবশ্য টাঙা ফেলে (এক ধরনের মাছ ধরার বর্শি) বড় বড় শোল বোয়াল ধরতাম। তাজা তাজা মাছের ঝোল দিয়ে গরম গরম ভাত খাওয়ার মজাই ছিলো অন্য রকম তৃপ্তির।

ভারী বর্ষনে যখন জন জীবন স্থবির হয়ে যেত তখন ছোটদের ঘরে আটকিয়ে রাখা খুব কষ্টকর ছিলো। ছোটদের ভুলিয়ে রাখার জন্য কিছুক্ষণ পর পর বাদাম, ডাল, বুট, কাঁঠালের দানা ভেজে দিতেন গৃহিণীরা। যাতে সময়টা পার করা যায়। ছোটরা লুডু বা খেজুরের দানা দিয়ে এক ধরনের খেলা খেলতো। বর্ষার সময় বেশি কষ্ট হতো খেটে খাওয়া মানুষদের, যারা দিন এনে দিন খেতো। কাজ নেই, আয় নেই, খাবার নেই; বড় অসহায় অবস্থায় পড়ে যেত তারা। এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে ধার দেনা করে চলতে হত। এ দৃশ্য

ছিলো খুবই করুণ। অস্বচ্ছল পরিবারের খাবার ছিলো মাড় মেশানো ভাত আর তরকারির পরিবর্তে শুকনো মরিচ পোড়া। বিদ্যুৎ নেই, কেরোসিন তেল নেই, আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা নেই। তখন সন্ধ্যার আগে আগে খাবার শেষ করে সন্ধ্যার পর পরই শুয়ে পড়তো তারা। গরু ছাগলের ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার অনেক দূর থেকে শোনা যেত।

সুখ দুঃখ নিয়েই বাংলায় বর্ষা আসে। একদিকে মানুষের জীবনযাত্রা থেমে যায়, জীবন ও জীবিকার ঘানি টানতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। অন্যদিকে গাছপালা পুনরায় প্রাণ খুঁজে পায়, পাতার রং সবুজ থেকে সবুজতর হয়। রোদের আলোয় ঝিকমিক করে সবুজবীথি। নতুন স্বপ্ন নিয়ে পথচলা শুরু। ■

স্বস্তির বৃষ্টি

পত্রালিকা বিশ্বাস

এই দাঁড়া দাঁড়া, একদম জলে পা দিবিনা, কথাটা বলা শেষও হয়নি উমার, তার আগেই ছপাৎ করে কাদা জলটার মধ্যে লাফ দেয় বুবলু। ইসস্ দিলি তো স্কুল ড্রেসটা শেষ করে, তোর বাবা অফিস থেকে ফিরুক দ্যাখ কি করে তোকে। বলতে বলতেই বুবলুর কানটা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায় উমা। বুবলুও তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে, "আমি তো একটু জলেই পা দিয়েছি, তো কি হয়েছে। তুমি যদি বাবাকে বলো আমিও বলে দেবো, কালকে দুপুরে ঘুম থেকে উঠে আমিও দেখেছি তুমি ছাদে উঠে বৃষ্টিতে ভিজছিলে।"

বুবলুর মুখে কথাটা শুনেই উমার খেয়াল হয় সত্যিই তো কালই তো দুপুরবেলা সেও বৃষ্টি নামতেই চলে গিয়েছিল ছাদে, আর তারপর একদম কাকভেজা হয়ে নেমেছিল। আসলে বরাবরই বৃষ্টির সাথে ওর মনের টান প্রবল, তাই বৃষ্টি নামলেই এক ছুট্টে চলে যায় ভিজতে। তারপর বুবলুর গালটা একটু টিপে দিয়ে বলে – খুব নালিশ করা শিখেছিস তো? চল তাড়াতাড়ি ঠান্ডা লেগে যাবে এবার।

বাড়ি ফিরেই তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদলে এই সময়টায় বুবলু অনেকক্ষণ বারান্দায় আপনমনে খেলে। কোনোদিন

গাড়ি, কোনোদিন বল আর আজকে বুবলু একটা নতুন খেলায় মেতেছে। একটা ছোট্ট গামলায় বৃষ্টির জল ধরে রেখে তার মধ্যে ওর খেলনা হাঁস, পাখি, কুকুর, খরগোশগুলোকে সাঁতার কাটা শেখাচ্ছে। অনেকক্ষন কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে উমাই দেখতে পায় বুবলুর কীর্তি। উমা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে কয়েকটা রঙিন কাগজ নিয়ে আসে আর বলে, বুবলু আয়, আমরা নৌকো বানিয়ে জলে ভাসাই।

বুবলুও বেশ খুশি। উমা দুই তিনটে নিজে বানাতেই বুবলুও শিখে যায় আর নিজে নিজেই নৌকো বানিয়ে ছাড়তে থাকে জলে। লাল, নীল, সবুজ নৌকো নিয়ে খেলতে খেলতেই বুবলু বলে ওঠে, "আচ্ছা মা যারা রাস্তায় থাকে, এই বৃষ্টিতে ওদের তো খুব কষ্ট বলো, ওদের ঘরে জল ঢুকে যায়, ওদের ছাতাও নেই। মা তুমি তো সবসময় বলো কেউ কষ্টে আছে দেখলে তাকে পারলে কিছু সাহায্য করো। আচ্ছা আমরা কি কিছু করতে পারিনা ওদের জন্য?"

"পারি তো সোনা, আমরাও ওদের ত্রিপল, ছাতা, প্লাস্টিক, কিছু শুকনো খাবার দিতেই পারি। কিন্তু একা তো অনেকের জন্য পারবো না বুবলু। আমার কাছে তো এত টাকা নেই, এগুলো কিনতে অনেকগুলো টাকা লাগবে। আমি কোথায় পাবো বলো? দেখি আজকে বাবা আসুক বলে দেখবো যদি বাবা কিছু করতে পারে।"

বুবলু একলাফে জড়িয়ে ধরে উমাকে, "কে বলেছে মা তোমার

কাছে নেই। আমার জন্মদিনে এবার কতগুলো টাকা দিয়েছে অনেকেই, ওগুলো দিয়েই আমরা কিনবো। আচ্ছা মা, মিনতি মাসীকেও একটা ছাতা কিনে দেবো, আমি দেখেছি মিনতি মাসী ভিজে ভিজেই কাজে আসে রোজ। তুমিই তো বলো মা বড়ো হয়ে নিজের উপার্জনে একজন অভাবী সন্তানের পড়াশোনার দায়িত্ব নিস, সে নয় তখন নেবো নিজের উপার্জনে, এখন তো সবে আমার ক্লাস ফাইভ, এখনও চাকরি করতে অনেক দেরী। এখন তাহলে উপহারটাই ভাগ করেনি সবার সাথে। তুমিই তো বলো আনন্দ ভাগ করলে বাড়ে।"

উমা কথাগুলো শুনতে শুনতেই অবাক হয়ে যায়, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বুবলুর মুখের দিকে, কেমন যেন মনে হয় এই বাদলা দিনেও আকাশ চিরে এক চিলতে আলো এসে পড়ছে বুবলুর চোখে মুখে, কেমন যেন মনে হচ্ছে এ শুধু আমার সন্তান নয়, সেই মানুষগুলোরও সন্তান যাদের প্রয়োজনে কোনো দ্বিধা না করেই হয়তো বুবলু গিয়ে দাঁড়াবেই একদিন। ■

একটা বৃষ্টি মুখর দিনের স্মৃতি

দোলা ভট্টাচার্য

আজকে বৃষ্টি শুধুই
বৃষ্টি সারা বেলা
থই থই প্রাণের স্রোতে
ভাসালাম গানের ভেলা।
বাদলা হাওয়ার গানে
মন আজ উঠল মেতে,
এল আজ এ কোন সকাল
অমৃতের পাত্র হাতে!
বিজলী দিচ্ছে ঝিলিক
কার আঁখি পল্লব ছায়
বিরহের গোপন কথা
হৃদয়ের কানায় কানায়!
এসো না আজকে তুমি
এসো আজ সজল প্রাণে,
বেয়ে এসো গানের ভেলা
বেদনার কমল বনে। ■

আষাঢ়

রমা সিকদার

ষাঢ়ের কাজল কালো চুলে
ঝরুক বাদল আজ সারাদিন...
ছুঁয়ে যেতে বিষাদ আমার
বৃষ্টি নুপুর সুরের তালে,
ঝরুক বাদল আজ সারাদিন
আমার দীর্ঘ শ্বাসে...
রিক্ত প্রণয় কি নেশায় পুলকিত মন!
শ্রাবণ শরীর ভূমিষ্ঠ যেন কদমের আখরে।

তুমি যদি আসতে তখন
মন দরিয়ায় বৃষ্টি যখন আসে;
ভেজে যখন হৃদয় আমার
খরতাপের দিনে অপেক্ষার শেষে।
দ্বিধারা মেঘে স্মৃতি মন্থন
দানা বাঁধে আকাশ বাসরে।

সিক্ত হৃদয় মুগ্ধ হয়
বড়ো একাকী নিরন্তরে,
নোনা কষ্ট যাক ধুয়ে যাক

বর্ষার বার্তা

ভালোবাসার নব বিনির্মাণে,
তাই ইচ্ছে করে চৈত্র দিনেও
মনের বিষাদ ধুয়ে দিতে
অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরুক,
ছুঁয়ে যেতে বিষাদ আমার।
রোদের খামে তার কথা থাক
অমৃত সুধা স্পর্শ মেখে অপূর্ব বৈভবে।। ■

বৃষ্টির সৃষ্টি

রিয়া মিত্র

মনের কোণে ভাবনা আসে
ভীষণভাবে বৃষ্টি হবে,
পুরনোকে মুছে দিয়ে
নতুনধারা সৃষ্টি হবে।
নতুন করে ভালোবাসার
বুনবে পাখি ঘর,
বৃষ্টিজলে প্রাণ পাবে যে
মনের চরাচর। ■

অরূপরতন

মঙ্গলপ্রসাদ মাইতি

সকাল থেকেই নদীর জলটা হু হু করে বাড়ছিল। খানিক পরেই তার দুরন্ত ঘোলা স্রোত দুকূল ছাপিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বর্ষায় শিলাবতীর এই রূপ, এই ছবি যাদবনগর গ্রামবাসীদের কাছে পরিচিত। ক'দিন ধরে যা বৃষ্টি হয়েছে তাতে বন্যা যে একটা না হয়ে যাবে না, এই ভাবনায় ভাবিত ছিল সকলেই। কিন্তু তখনও তাদের জানা ছিল না এবারের বন্যাটা এক বীভৎস রূপ ধারণ করবে। এতদিনকার চেনা-জানা রূপকে মাড়িয়ে দিয়ে দু:সহ করালগ্রাসে পতিত হবে হতভাগ্য গ্রাম্য মানুষগুলির জীবন।

দুপুরের আগেই ঘূর্ণায়মান বন্যার কাদাজলে যাদবনগর গ্রামের রাস্তাঘাট সব ভরে গেল। ভেসে গেল পুকুর-ডোবা। পাড়াগুলি একে অন্যের থেকে হয়ে পড়ল বিচ্ছিন্ন। না, তখনো যাদবনগরবাসীরা ভয় পায়নি। প্রতিবার যা হয় সেরকমই চিত্র, দৃশ্য প্রতিভাত হচ্ছিল। কেউ জাল ফেলে মাছ ধরছিল, কেউ কেউ তাসের আড্ডা জমিয়েছিল, কেউ বসেছিল গল্পের বই নিয়ে। ছেলে-যুবকরা নৌকা আর কলার ভেলা করে খুশির আনন্দে এপাড়া-ওপাড়া হচ্ছিল।

বর্ষার বার্তা

দুপুরের ঠিক পর থেকেই ভয় পেতে শুরু করল যাদবনগর গ্রামের লোকেরা। জলের মাত্রা কমা তো দূরের কথা, তরতর করে জল বেড়েই চলেছে। বিপদসীমা অতিক্রম করে গেছে। একটা-দুটা-তিনটা শেষে সব পাথরের ধাপ উপচে ঘরের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে গেল জল। এদিকে আকাশ অন্ধকার করা ঘন কালো মেঘ। দমকে দমকে বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে প্রবল ঝাপটা। বন্যার বেগ আরও বেড়ে গেল। লাফিয়ে লাফিয়ে ঝলকে ঝলকে জল বেড়ে সবকিছু ডুবিয়ে দিচ্ছে, ভাসিয়ে দিচ্ছে। এক উন্মত্ত গর্জনে শীলাবতী ফুঁসছে, নাচছে, দুলছে। মেঘের গুরু গুরু গর্জন আর বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দে দুনিয়াসুদ্ধ কেঁপে উঠছে। যেন প্রলয় নাচনে নেচে উঠেছে পৃথিবী। ধ্বংসের এক জাগ্রত প্রতিমূর্তি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে গ্রামবাসীদের সামনে।

চোখের সামনেই মদন মণ্ডলের নতুন মাটির তৈরি বড় বারান্দা-ঘরটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বন্যার জলে। তার ঢেউ গিয়ে ভাঙল আর একটা ঘর। এইভাবে একটা ঘর ভাঙে-তার বিকট ঢেউ গিয়ে আছড়ে পড়ে আর একটা ঘরে। মানুষের হাঁক-ডাক, আর্তনাদ আর কান্নার রোল ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে, এরপর কী হবে, কে কাকে বাঁচাবে, পরিত্রাণের উপায় কী; এই ভাবনায়, এই আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠল যাদবনগর গ্রামের আর্ত-অসহায় প্রাণগুলি। ক্রুদ্ধ আক্রোশে

বর্ষার বার্তা

শিলাবতী গোঙাচ্ছে আর অন্যদিকে বন্যার্ত মানুষগুলির অসহায় কাতরানি; সবকিছু মিলে সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য মাটির পৃথিবীতে। মানুষেরা উঁচু জায়গা দেখে সরে যাচ্ছে। কিন্তু গৃহপালিত গবাদি পশুগুলির অবস্থা হয়েছে আরও অসহায়, করুণ। ঘরের লোক গরু-ছাগলের গলার দড়িগুলি খুলে দিচ্ছে। ঠায় গলায় দড়ি দিয়ে মরবে কেন? তার চেয়ে ভেসে যাক। যদি উঁচু জায়গায় গিয়ে কোনোরকম আশ্রয় পায়। গরু ভেসে যাচ্ছে, তার উপরে পিড়ি পাকিয়ে বসে রয়েছে সাপ। এমন বিপদের ক্ষণে সাপও কামড়াতে ভুলে গেছে। সেও বাঁচতে চায়।

অরূপ তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে নেমে পড়েছে উদ্ধারের কাজে। এমন বিপদের সময়ে তারা কী স্থির থাকতে পারে? এই অরূপ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গো – বিশু, হরি, কার্তিক, ভজন, সমীরদের সুনামের বদলে বদনামই বেশি। এদের পরিচয় এরা সব বাপ-মায়ের শাসন না মানা বখাটে, বাউন্ডুলে ধূর্তের দল। এরা নাকি ভদ্রতার ধার ধারে না। কালী-শীতলা পূজায় গ্রামবাসীদের কাছ থেক বেশি টাকা চাঁদা আদায় করে জোর করে। আর সেই টাকায় এরা মদ খায়, গাঁজা টানে, ফুর্তি-আমোদ, হই-হুল্লোড় করে। এক কথায় এরা সব গোল্লায় যাওয়া ছেলে; অপদার্থের দল। অথচ এই বন্যার মুহূর্তে সেই অপদার্থের দল অরূপরাই বন্যার্ত মানুষ-গুলিকে উদ্ধার করছে। নীচু জায়গা থেকে উঁচু নিরাপদ জায়গায়

পৌঁছে দিচ্ছে। আজ এই বিপদের সময়ে তারাই হয়ে উঠেছে এক একজন ভগবান। বিপদগ্রস্থ মানুষগুলির রক্ষাকর্তা। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাধ্যমতো চেষ্টা করছে তারা। কিন্তু সমস্যা হয়েছে, গ্রামে নৌকা মাত্র একটি। একটি নৌকা দিয়ে কাজের সংকুলান হচ্ছে না। নৌকা দেখলেই সব পাড়ারই লোকজন হাত নেড়ে চিৎকার করে ডাকছে, আমাদের আগে নিয়ে যাও। আমরা যে নাহলে তলিয়ে যাব।

অরূপরা অবশ্য বুদ্ধি করে, মাথা খাটিয়ে কাজ করছে। গ্রামের সব জায়গা তাদের নখদর্পণে। কোন জায়গার জল কতটা গিয়ে পৌঁছবে এ তাদের পদ্যের মতো মুখস্থ। সেই মতো কাজ করছে তারা। কিন্তু বন্যার জল এমনভাবে বাড়ছে তাতে করে তাদের সব হিসাবের গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তবু চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না তারা।

নদীর একেবারে ধার ঘেঁষে বেরাপাড়া। চার ঘর-বসতি মাত্র। সেখানকার ছেলে-মেয়ে, শিশু-বুড়ো করে পনেরো-ষোলো জনের মতো লোক হবে। প্রায় মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এই মানুষগুলি। তারা নৌকাটা দেখতে পেয়েই পাগলের মতো চিৎকার করছে, আমাদের নিয়ে যাও তোমরা। নৌকাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি এসো। অরূপের কানে পৌঁছায় তাদের এই অসহায়তার কান্না এবং চিৎকার। সে বলে, “এবার নৌকাটা বেরাপাড়ার দিকে নিয়ে চল।”

বর্ষার বার্তা

বিশু আর জগা নৌকা বাইছিল। তারা বলল, "খেপেছ অরূপদা, ওখানে যাওয়া মোটেই ঠিক হবে না। একটুখানি বেসামাল হলেই নৌকা গিয়ে পড়বে সরাসরি শিলাবতীর ঘূর্ণিস্রোতে। আর একবার পড়ে গেলে নৌকা তুলে আনা সম্ভব হবে না। যে ক'জনকে উদ্ধার করছিলাম তাও আর করা যাবে না।"

অরূপ চিৎকার করে উঠে, "তাহলে ওই বেরাপাড়ার মানুষগুলির এখন কী হবে? বন্যার যা গতিবেগ তাতে করে ওরা তো কেউ বাঁচবে না মনে হচ্ছে।"

"সে তো বুঝেছি। কিন্তু নিজেদের কথাটাও তো ভাবতে হবে। এই ঝড়-বাদলে ভিজে একসা আমরা। শরীরে কাঁপন ধরে আসছে। তারপর সন্ধে নামছে। বাতাসে-ঝাপটায় নৌকা টলমল করছে। এই অবস্থায় বেরাপাড়ায় নৌকা নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।"

অরূপ বলে, "তোদের যেতে হবে না। যেখানে যাচ্ছিস যা... আমি চললাম বেরাপাড়ার মানুষগুলিকে বাঁচাতে। মনে হচ্ছে বাঁধটা এখনো সারানো হয়নি। এক কোমর, কি বড়ো জোর এক বুক জল হবে। আমি চললাম।" বলেই নৌকা থেকে জলে নেমে পড়ল অরূপ।

বিশু হা-হা করে ওঠে, "অতবড়ো ঝুঁকি তুই নিস না অরূপ। শেষে কী নিজের প্রাণটাই খোয়াবি?"

"ধুত্তেরি, এমন প্রাণের নিকুচি করেছে। গ্রামের লোক যদি

বন্যার জলে তলিয়েই গেল, তবে আমি আমার এই প্রাণটা রেখে কী করবো?" অরূপ তার বন্ধুদের বাধা মানলো না। বাঁধ বরাবর সন্তর্পণে পা ফেলতে ফেলতে বেরাপাড়ার দিকে এগিয়ে গেল।

বেরাপাড়ার মানুষজন অরূপকে দেখে লাফিয়ে উঠল। একটা নির্ভাবনার রেখা ফুটে উঠল তাদের কপালে। অরূপকে এই মুহূর্তে যেন দেবদূত বলে মনে হচ্ছে তাদের। পনেরো-ষোলোটি প্রাণী একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, "আমাকে নিয়ে চলো, আগে আমাকে নিয়ে চলো।"

অরূপের মেজাজটা এমনিতেই গরম ছিল। সেই তিরিক্ষে মেজাজটা নিয়েই বলল, "শোনো, হুটোপুটি করবে না কেউ, তাড়াহুড়োও করবে না। কথা দিচ্ছি আমি তোমাদের সকলকে বাঁচাবো। কী তোমরা সকলে বাঁচতে চাও তো নাকি?"

—হ্যাঁ, আমরা বাঁচতে চাই। সবাই একসঙ্গে বলে উঠল।

—তাহলে আমার কথাটা শোনো। আগে আমি এখনকার বাচ্চাদের নিয়ে যাব, তারপরে বয়স্কদের, সবশেষে অন্যান্যদের।

—তাই করো বাবা, তাই করো। তুমি আমাদের যে কোনোভাবে উদ্ধার করো। বেরাপাড়ার সবচেয়ে বয়স্কা মহিলাটি উত্তর দিল।

অরূপ প্রথমে দু'জন বাচ্চাকে নিয়ে নিরাপদ স্থানে রেখে এল। তারপর কথামতো বয়স্কাদের পার করল। এদিকে জল

তীব্রবেগে বাড়ছে। প্রথম যখন বাঁধটা ধরে অরূপ আসছিল তখন একবুক জল ছিল। সেটা এখন বেড়ে গলা অব্দি ছুঁয়েছে। পনেরো জন মানুষকে উদ্ধার করে দিয়েছে অরূপ। আর একজন মাত্র আছে, মাধুরী। একুশ বছরের মাধুরী। তাকে পার করে দিতে পারলেই খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারবে অরূপ। এরই মধ্যে জলটা আরও বেড়ে গেছে। প্রায় মাথা ডুবুডুবু। এদিকে সন্ধেও নেমে এসেছে। গাছের ছায়া জলের মধ্যে পড়ে এক কিম্ভুতকিমাকার দৃশ্যের অবতারণা করেছে। পুরো পরিবেশটাই যেন ভয়ের পরিবেশ। তার উপরে বৃষ্টি হচ্ছে, বাজ পড়ছে, ঝাপটা দিচ্ছে। সব কিছু মিলে এক দুর্যোগপূর্ণ চেহারা নিয়েছে।

ইদানীং মাধুরীর সঙ্গে অরূপের সম্পর্কটা ভালো যাচ্ছিল না। কিন্তু একসময় অরূপ-মাধুরীর মধ্যে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। মাধুরীকে বড্ড ভালোবেসেছিল অরূপ। মাধুরীরও সায় ছিল তাতে। তারপর কী যে কী হ'ল- দুজনের মধ্যে দূরত্ব বাড়ল। একদিন তর্কাতর্কি, কথা কাটাকাটি হতে হতে অরূপের গালে সজোরে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল মাধুরী। অরূপ আর কথা বাড়ায়নি। মাধুরীর দেওয়া সব অপমান সহ্য করে মাথা নিচু করে বাড়ি ফিরে এসেছিল সে। সুন্দরী, তন্বী-তনয়া, বড়োলোকের খেয়ালি মেয়ে মাধুরীর প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা তৈরি হয়েছিল তার। প্রতিজ্ঞা করেছিল মাধুরীর মুখ সে আর কোনোদিন দেখবে না।

কিন্তু কী আশ্চর্য! আসন্ন ভয়ঙ্কর বিপদ তাদেরকে আবার এক জায়গায় মিলিয়ে দিয়েছে। এই মুহূর্তে অরূপ ভুলে গেছে মান-অপমানের কথা। সব তিক্ততা ভুলে মাধুরীও অরূপের শরণাপন্ন। যে অরূপকে একদিন তীব্র অপমান করে দূরে ঠেলে দিয়েছিল সেই অরূপই এখন পরিত্রাতার ভূমিকায়। দেবদূত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

অরূপ ডাকে – এসো মাধুরী, আমার হাতটা ধরো। মাধুরী তিলমাত্র অপেক্ষা না করে অরূপের বাড়ানো হাতে তার নিজের ডান হাতটা রাখে আর বলে, “আমার যে বড়ো ভয় করছে অরূপদা।”

— আরে, ভয়ের কী আছে! আমি আছি না। এতগুলো মানুষকে যখন বাঁচাতে পেরেছি, নিশ্চিত তোমাকেও বাঁচাতে পারব।

— তোমার হাতটা কী ঠাণ্ডা!

— ঠাণ্ডা হবে না! কখন থেকে জল ঘাঁটছি বলতো। নাও, এসো। আর এক মুহূর্ত দেরি করা ঠিক হবে না। দেখছো তো তোমাদের বাড়ির দেওয়ালে জল লেগে গেছে। হেলে পড়েছে বাড়িটা, এক্ষুণি বোধহয় ভেঙে পড়বে। বলতে বলতেই মাধুরীদের বাড়িটা বন্যার জলে সশব্দে ভেঙে পড়ল। পরপর তার লাগোয়া আরও ক’টা বাড়ি ধ্বসে গেল। খড়ের চালগুলো কচুরিপানার মতো ভেসে যেতে লাগল বন্যার স্রোতে। সীমাহীন আতঙ্কে মাধুরী অরূপকে জড়িয়ে ধরল। ভয়ে দু’চোখ তার বন্ধ হয়ে গেছে।

অন্য সময় হলে কী হত বলা যায় না। বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে এ মুহূর্তে অরূপ তেমনভাবে রোমান্টিক হতে পারল না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাত-পা যেন তার বসে যেতে চাইছে। মাধুরীর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অরূপ বলল, “আর একদণ্ডও দাঁড়ানো ঠিক হবে না মাধুরী। শেষে কী দুজনেই মরব?”

অরূপ মাধুরীকে নিয়ে বাঁধরাস্তা ধরে এগোতে লাগল। জলটা আরও বেড়ে গেছে। তারই মধ্যে জীবন বিপন্ন করে মাধুরীকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে অরূপ। জলের তলায় পা হড়কে যাচ্ছে। সামলানো দায় হয়ে পড়েছে। নাকে-মুখে জল ঢুকে যাচ্ছে। অরূপ হার মানবার পাত্র নয়। অত্যন্ত সুকৌশলে সে প্রায় বুকে আগলে মাধুরীকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আর একটুখানি পথ পেরিয়ে গেলেই নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যাবে তারা। ওখানে বিশু-জগারা নৌকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একপাড়ার মানুষকে রক্ষা করে তারা এবার এখানে। অরূপকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে তারা। নিরাপদ জায়গার কাছাকাছি প্রায় এসে গেছে আর তখনই ঘটল ভয়ঙ্কর বিপদটা। জলের ভিতরে বাঁধরাস্তাটা এতক্ষণ ডুবেছিল, এবার বন্যার তোড়ে হুড়মুড় করে ধ্বসে গেল। মাধুরীকে এক ঝটকায় আরও কিছুটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে চিৎকার করে বলল, “বিশু, তোরা মাধুরীকে বাঁচা, নৌকার বাঁশটা বাড়া। আমি ভর পাচ্ছি না।”

বিশু বিদ্যুৎগতিতে বাঁশটা বাড়িয়ে বলল, "মাধুরী, শক্ত করে ধরো।" মাধুরী তাই করল। বাঁশটা ধরে এগিয়ে তারা মাধুরীকে নৌকায় টেনে তুলে নিল।

কিন্তু অরূপ! অরূপ কোথায়? অরূপকে দেখতে না পেয়ে চিৎকার করে উঠল বিশু, জগারা। আর্তনাদ করে উঠল মাধুরী, "অরূপদা, তুমি কোথায়? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

বন্যার ক্রুদ্ধ আস্ফালন, বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ, মেঘের গগনবিদারী আওয়াজই কেবল একসঙ্গে শোনা গেল। অরূপের কোনো সাড়া মিলল না।

জলের ভিতর বাঁধটা ভেঙে যাওয়ায় প্রচণ্ড জলরাশি প্রবল বেগে গিয়ে শিলাবতীর বুকে আছড়ে পড়ল। দুরন্ত স্রোতপ্রবাহ তখন। মাধুরীকে বাঁচাতে পারলেও অরূপ নিজেকে সেই প্রবল স্রোতপ্রবাহে সামলাতে পারল না। পা হড়কাতেই, বাণের জল তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বরফের মতো ঠাণ্ডা জল। তার উপর বৃষ্টি হচ্ছে। অনেক্ষণ জলের মধ্যে থেকে অরূপের শরীরে একটা কাঁপন চলে এসেছিল। বড্ড ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়েছিল সে। বাঁধটা ভেঙে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বন্যার স্রোতের সঙ্গে সেও গিয়ে পড়ল একেবারে মাঝনদীতে। তখন সে এতটাই ক্লান্ত জলের সঙ্গে যুঝবার শক্তি তখন আর তার ছিল না। চিরতরে সে তলিয়ে গেল বন্যার অতল গর্ভে। যে ছিল গ্রামের মানুষদের কাছে নিতান্তই বাউন্ডুলে, বখাটে, মাতাল একটা যুবক – সেই তার

নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেল, তার বুকের মধ্যেও একটা মহৎ প্রাণ লুকিয়ে ছিল, ছিল একটা সত্যিকারের বড়ো হৃদয়।

দু'দিন পরে বন্যার জল যখন সরল তখন দেখা গেল গ্রামের সবাই বেঁচে আছে। অনেকে তাদের ঘর-বাড়ি হারালেও দিব্যি টিকে আছে তাদের জীবন। তাদের মধ্যে শুধু নেই একজন, সে অরূপ। না, অরূপের মৃতদেহটা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও খুঁজে পায়নি গ্রামবাসীরা। বন্যার তোড়ে কোথায় কোন দূরদেশে ভেসে গেছে কে জানে!

যাদবনগরবাসীরা প্রতিবছর শ্রদ্ধাভরে অরূপের জন্মদিন-মৃত্যুদিন পালন করে। তার স্মৃতিতে একটা বেদিও তৈরি করেছে তারা। অরূপ যে তাদের কাছে এখন একটি রত্ন — অরূপরতন! ■

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলেজ স্ট্রীটে 'অরণ্যমন'এর স্টল থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

URL: https://www.boichoi.com/RohosyerCharOdhyay

কলকাতার অন্যান্য বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...

PREVENTION OF COVID - 19
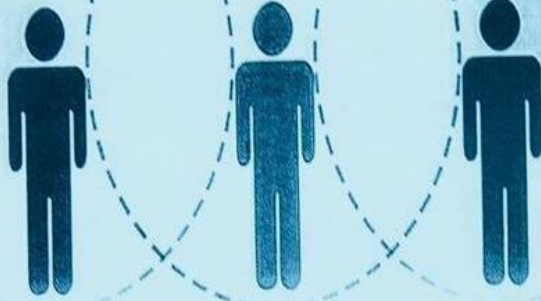
SOCIAL DISTANCING

Photo by Ekaterina Belinskaya from Pexels

PREVENTION OF COVID - 19
Photo by Anna Shvets from Pexels

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল' (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর 'পাণ্ডুলিপি' 'গ্রুপে'ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: জুলাই সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১০ ই জুলাই, ২০২০।